ফাঁসির মঞ্চ থেকে বলছি

শহীদ সায়্যিদ কুতুব

অনুবাদ:

মুহাম্মদ ইলিয়াছ আরমান

ফাঁসির মঞ্চ থেকে বলছি * শহীদ সাইয়্যিদ কুতুব অনুবাদ: মুহাম্মদ ইলিয়াছ আরমান

প্রথম প্রকাশ * ০১ এপ্রিল ২০০৭ প্রকাশক * দ্যা ম্যাসেজ পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম

স্বত্ব * অনুবাদক
মূল্য * ত্রিশ টাকা মাত্র
1

FASHIR MONS THEKE BALSI

By SAYED QUTUB

TRANSLATION: ELIAS ARMAN

Published in 01 April 2007

Published by THE MESSAGE PUBLICATION,

CHITTAGONG, BANGLADESH

পরিবেশক

মাহমুদ পাবলিকেশন্স

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ৭১২৩৯২৪

মোবা: ০১৭১৫-৪৪১৫৫৭

প্রকাশকের কথা

বিংশ শতাব্দীর কালজয়ী প্রতিভা, ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী আন্দোলন “ইখওয়ানুল মুসলিমিনে”র প্রাণপুরুষ সৈয়দ কুতুব শহীদ (রহ.) রচিত প্রতিটি গ্রন্থ ঈমানদীন্ত ও ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। তাঁর সাহিত্য ভান্ডার ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে, মৃতপ্রায় জাতিকে করে প্রাণবন্ত, তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে সঞ্জীবনীশক্তি এবং আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক মুমিনকে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনির প্রতিটি বাক্যে কোরআনের অমরবাণী কালজয়ী মিশন পৌঁছে দেওয়ার এক প্রচণ্ড তাকিদ রয়েছে।তাঁর কর্মময় জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিক ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ততা। যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি পেয়েছিলেন নব জীবন, যাকে তিনি স্বয়ং তার দ্বিতীয় জন্ম বলে

ঘোষণা দিয়েছেন। ইখওয়ানের জন্য অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও অবশেষে ফাঁসির মঞ্চে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এ করুণ পরিণতির মর্মান্তিক ঘটনা কারাগারে বসে বন্দী জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানের ঈমানদীপ্ত অনুভূতি অকপটে বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন তার বর্ণাঢ্য জীবনের বিরল কীর্তি সর্বশেষ গ্রন্থ “লিমা-যা ‘আদামূনী”। “ফাঁসির মঞ্চ থেকে বলছি” শিরোনামে বইটি সাবলীল অনুবাদ করেছে আমার স্নেহধন্য ছাত্র, তরুণ লিখক মুহাম্মদ ইলিয়াছ আরমান। অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করায় তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, অনবদ্য এ বইটি প্রকাশে বাংলাভাষী পাঠকদের দ্বীনে ইসলামের পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ তিতিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে।

আমরা “দ্যা ম্যাসেজ পাবলিকেশন”র পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তাড়াহুড়ার কারণে মুদ্রণজনিত ভুলক্রটি থাকা স্থাভাবিক। এ ব্যাপারে বিদগ্ধ পাঠকদের সুপরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণ আরো নিখুঁত ও আকর্ষণীয় করা হবে ইন-শা- আল্লাহ্।

মা আসসালাম

সভাপতি

দ্যা ম্যাসেজ পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবু বকর রফিক সাহেবের অভিমত

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী আন্দোলন মিশরের “ইখওয়ানুল মুসলেমীন’র প্রাণপুরুষ সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহ. বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে একটি অতি পরিচিত নাম। তার বর্ণাঢ্য জীবনের সবচেয়ে আলোচিত দিক ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ততা। এ জন্য অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবশেষে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দেয়ার মত করুণ পরিণতির মর্মস্পর্শী কাহিনীর অকপট বিবরণ তুলে ধরে কারাগারে বসে তিনি লিখেছেন জীবনের শেষ বই “লিমা-যা আ’দমূনী”। “ফাসির মঞ্চ থেকে বলছি” শিরোনামে এই বিরল ও অনবদ্য গ্রন্থটি সাবলীল ও সুন্দর অনুবাদ

করেছে আমাদের প্রিয় ছাত্র তরুণ লেখক ও অনুবাদক মুহাম্মদ ইলিয়াছ আরমান। বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে এই মূল্যবান বইটি তুলে দেয়ার জন্য আমি তাকে আস্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং বইটির বহুল প্রচার ও অনুবাদকের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

(প্রফেসর) ড. আবু বকর রফিক

২৪/০৩/০৭

চট্টগ্রাম জামেয়া দীরুদ মা’আরিফ আল-ইসলামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা, মাসিক ‘আল-হক’ সম্পাদনা পরিষদের সিনিয়র সদস্য, বিশিষ্ট অনুবাদক, লেখক ও কলামিস্ট এম. এম. ফুরকানুল্লাহ সাহেবের অভিমত

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, কালজয়ী ইসলামী চিন্তানায়ক, অপ্রতিদ্বন্দী লেখক, মুসলিম ব্রাদার হুডের অবিসংবাদিত নেতা মিশরের সায়্যিদ কুতুব (শহীদ) সর্ব মহলে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ৷ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জাত শত্রু যায়নিষ্ঠ ও ক্রুসেডার চক্ররের ইন্ধনে স্বদেশীয় তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী সামরিক জান্তার হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন অকুতোভয় দুঃসাহসী কৃতী পুরুষ সায়্যিদ কুতুব রহ.। জ্ঞানসাধনা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস এবং তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রচার-প্রসারই ছিলো তার জীবনের পবিত্র ব্রত। গভীরতম অধ্যাবসায় ও লেখনী শক্তির সদ্ব্যবহার তাঁর শিরে মহত্বের মুকুট পরায় এবং দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস ও নির্মল আদর্শ ইসলামী নেতৃত্বের সিংহাসনে বসায়। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন ও সমাজে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন সধা সোচ্চার ও আপোষহীন। “জাহেলিয়্যাত আল-করন আল- ইশরীন” (বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়্যাত) রচনা করে আত্ম সচেতনতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তার এই যুগান্তকারী গ্রন্থটি যেমন বিশ্বের অগণিত মুসলিম যুবা-তরুণের হৃদয়ে সুপ্ত ঈমানী শক্তি জাগ্রত করে তেমনি ক্রসেডার, যায়নিষ্ট ও কমিউনিষ্ট শক্তির মদদে মুসলিম ও আবর বিশ্বের ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট ও সোসালিষ্টদের তখ্ত তাউসে কম্পন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মিশরের সামরিক জান্তার রোষানলে পড়ে যান তিনি। চালানো হয় নির্যাতনের স্ট্রীমরোলার ৷ নাইন ইলাভেন এর ঘটনার আদলে মিশরেও বেশ কটি আত্মঘাতী ঘটনা ঘটে। যে গুলো এখনো পর্যন্ত রহস্যাবৃত। কিন্তু আমেরিকা যেমন কোনো তদন্ত ছাড়াই

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় আল-কায়দার প্রতি দোষারোপ করে আফগানিস্তান ও ইরাকে ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালায় তেমনি মিশরীয় প্রশাসন সংঘটিত ঘটনাসমূহের জন্যে ইখওয়ান নিধনের পথ বেচে নেয়। হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মী ও সমর্থককে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে হাজারো অভিযুক্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তদের শীর্ষ অপরাধী (?) হলেন সায়্যিদ কুতুব। ইখওয়ানের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা, জেলে যাওয়া ও মৃত্যুদন্ড পাওয়া সহ নানাবিধ ঘটনা প্রবাহ লিপিবদ্ধ করেন তার দিনপঞ্জীতে। তাঁর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়ার পর ওসব প্রমাণ্য তথ্য তাঁর শুভাকাঙ্খীরা “লিমা-যা আ’দামূনী” পুস্তকারে প্রকাশ করেন। তথ্যসমৃদ্ধ এপুস্তকটি ইসলামী দাওয়াত-তাবলীগ ও সংগ্রাম-আন্দোলনে নিয়োজিতদের জন্যে জীবন পাথেয় হতে পারে। পুস্তকটি মূল আরবী থেকে “ফাসির মঞ্চ থেকে বলছি” শিরোনাম দিয়ে সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন আমার সুপ্রিয় ছাত্র ইলিয়াছ আরমান। লেখককে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং তরুণ অনুবাদককে আরো জোরদার ও প্রাঞ্জল ভাষায় তরজমা করার তৌফিক দান করুন৷ আমীন

মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলীল

২৭/০৩/০৭

লেখকের ভাষায় গ্রন্থের পরিচয়

ইতিপূর্বে আমি এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখেছি। কিন্তু সেখানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ও প্রাসংগিক ঘটনাসমূহের সম্যক আলোচনা ছিল না। ফলে আমার অবস্থান নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তাকারে সে প্রতিবেদন লেখায় আমার আবেগ-অনুভূতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয়নি। আমি আশা করি, এই নতুন বিস্তাবরিত বর্ণনায় সন্দেহ দূরভিত হবে এবং আমার অবস্থান সঠিকভাবে ফুটে উঠবে। আল্লাহ্ ভাল জানেন, আমি কখনো নিজের জীবন নিয়ে চিন্তিত হয়নি এবং উক্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেনি; বরং আমি তা দ্বারা আমার সামর্থ অনুযায়ী ঐ সমস্ত যুরকদের রক্ষা করতে. চেয়েছি যারা এই আন্দোলনে আমার সাথে কাজ করেছে। কারণ আমি বিশ্বাস করি, তারাই এই প্রজন্মের সর্বত্তোম দল এবং ইসলাম ও মানবতার জন্য মূল্যবান সম্পদ। তারা বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। তাদের মুক্তির জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা না করলে আল্লাহর কাছে আমি দীয়বন্ধ থাকব। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমার লিখিত সেই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। আল্লাহ ভাল জানেন, আমি কখনো নিজেকে নিয়ে ভাবিনি; বরং আমি আমার প্রথম এই উক্তি থেকে তাদের দায়িত্বটা পরিপূর্ণভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি? আমার উক্তিটি হল-ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত গোপন সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করার বিনিময়ে মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করার সময় এসেছে মুসলমানদের জন্য। এর জন্য যে রকম পন্থাই অবলম্বন করুক না কেন? যদিও এর জন্য মানব রচিত সংবিধান মতে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে-ছয়। এই সংক্ষিপ্ত

ভূমিকায় আমি অকপটে স্বীকার করব যে, সে প্রথম প্রতিবেদনটি সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল। কারণ মুসলিম বন্দি কখনো নিজ সহকর্মী সৈন্যদের গোপন পরিকল্পনা ও রহস্য প্রকাশ করতে পারে না।আমি পছন্দ করি বিভিন্ন সংগঠন ও মানব রচিত সংবিধানের তোয়াক্কা না করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রেখে ইসলামী ভাবধারায় আমার দায়িত্ব পালন করতে। এখন আমি সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সবিস্তারে সবকিছু বর্ণনা করব। কারণ বর্ণনা না করার সেই বাঁধাটি আমার থেকে সরে গেছে। যদি কিছু ছুটে যায় তাহলে আমাকে জিজ্ঞাস করে অথবা সেই পাঁচ যুবক বা অন্য যারা এর সাথে জড়িত তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার থেকে জানা যাবে। আর সময়ের ধারাবাহিকতা এই ক্ষেত্রে আমার খুব সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, এই সমস্ত যুবকরা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এই বিষয়ের দায়িত্বশীলদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, লেখা-লেখির সাথে আমার সম্পর্কের চল্লিশ বছরের অর্জিত নিদিষ্ট পদ্ধতি ও স্টাইলে আমি লিখব। কিছু ঘটনা বর্ণনা করার সময় এর নেপথ্য কাহিনী, পরিপার্শ্বীক অবস্থা ও তার উপর মন্তব্য লিখতে হবে। আর কিছু ঘটনা মন্তব্য ও পর্যালোচনা ব্যতীত বর্ণনা করব। যদিও এতে তারা বিব্রত বোধ করে। কারণ তারা শুধু ঘটনা ও ব্যক্তির বর্ণনা দেখে আহ্লাদিত হয়। তবে আমি প্রয়োজন ছাড়া কোন ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য ও পর্যালোচনা পেশ করব না।

সায়্যিদ কুতুব

অনুবাদকের কথা

শহীদ সায়্যিদ কুতুব বিংশ শতাব্দীর এক কিংবদন্তী ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ইসলামী সাহিত্যঙ্গনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামের এই ক্রান্তিকালে তিনি হেরার আলোয় আলোকিত হয়ে নিজের ধারালো কলম ছারা ইসলামের হৃত স্থান ফিরিয়ে আনার জন্য যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। তার অবদান মুসলিম জাতি কখনো ভুলতে পারবে না। তিনি ইসলামের ইতিহাসে চির অমর হয়ে থাকবেন।

পৃথিবীর বুকে বিশেষত “সাংস্কৃতির কা’বা” হিসেবে খ্যাত মিসরে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, কুরআনী বসুন্ধরা দাঁড় করা ও হেরার রাজ কায়েম করা ছিল সায়্যিদ কুতুবের একমাত্র প্রত্যোশা ও আকাংখা। এজন্য তিনি মিসরের বিশ্ব নন্দিত ইসলামী আন্দোলন “ইখওয়ানুল মুসলিমীনে” যোগদান করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৬৬ সালে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। শাহাদাতের পূর্বে তিনি লিখে গেছেন জীবনের সর্বশেষ বই “লি-মাযা আ’দামুনী” বইটির বঙ্গানুবাদ “ফীসির মঞ্চ থেকে বলছি” নিয়ে আজ আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকদের কাঁছে উপস্থিত হতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

অনুবাদকর্ম কতটা সফল হয়েছে তা এখনো অনুভব করতে পারছি না। তবে আমার জীবনের প্রথম বইটি পাঠ করে পাঠকগণ অন্তত: বিরক্তিবোধ করনেনি এতটুকু জানতে পারলেই আমার দুর্ভাবনার অবসান ঘটবে।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ড. আবু বকর রফীক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক কলামিষ্ট মাওলানা ফুরকানুল্লাহ খলীলকে। তাঁরা বইটি সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত পেশ করে বইটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি
6

করেছেন। অনুগ্রহ স্বীকার করছি আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ সাদিক হুসাইন, মোস্তফা কামেল, বড় ভাই শফিউল্লাহ কুতুবী ও আলা উদ্দীন চৌধুরীর। এই আনন্দঘন মুহূর্তে স্মরণ করছি বদ্ধুবর হারুনুর রশীদকেও। তিনি আমাকে লেখা-লেখির ময়দানে নিয়ে এসেছেন এবং এখনো সামনে চলার সাহস যোগাচ্ছেন।
সর্বশেষে “দ্যা ম্যাসেজ পাবলিকেশন” কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তারা বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব না নিলে বইটি আলোর মুখ দেখতো না। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ ইলিয়াছ আরমান
৩০/০৩/২০০৭ইং

সূচিপত্রঃ
মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে যেভাবে যুক্ত হলাম: অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপ্রবাহ..........................................9 তাররাঃ নিন্দিত এক কসাইখানা...............................13 ইসলামী আন্দোলনঃ
অভিযান যেখানে মূল থেকে শুরু হয়..........................15 সম্পদ ও অস্ত্রের সন্ধানেঃ.................................21 ইসলামী আন্দোলনের বাঁধাঃ প্রতিরোধ পরিকল্পনা..26 বহির্বিশ্বের ইখওয়ানদের সাথে আমাদের সম্পর্কঃ 29 অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সম্পর্ক..............................40 ইখওয়ানের পরিমন্ডলের বাইরে অন্যান্যদের
সাথে আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগ..............................42 কিছু বিক্ষিপ্ত সম্পর্কের বিবরণঃ......................44

মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনের সাথে যেভাবে যুক্ত হলামঃ

অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপ্রবাহ
এখানে আমি ১৯৫৩ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীন তথা মুসলিম ব্রাদার হুড-এ যোগদানের পর থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমার তৎপরতার দিরিস্তি তুলে ধরছি। কারণ উক্ত সংগঠনের সাথে আমার সম্পৃক্ততার সময়ের এই প্রথম পর্বকে দ্বিতীয় পর্বের মুখবন্ধ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই পর্বে এমন একটি তাৎপর্যমন্ডিত ঘটনা ঘটেছে যেটি ইখওয়ান ও অন্যান্য দেশের সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে এবং ১৯৫৪ সালে সৃষ্ট সমস্যার মোড় বদলে দিয়েছে। ঘটনাটি উপযুক্ত স্থানে বর্ণনা করব।

আমি ১৯৪৮ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে আমেরিকা গমণের পূর্ব পর্যন্ত ইখওয়ান সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল খুবই অপ্রতুল। আমার সেখানে অবস্থানকালে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে হাসানুল বান্না শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। এরপর মার্কিন ও অন্যান্য দেশের ইংরেজী পত্রিকাগুলো হাসানুল বান্নার হত্যায় ও তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতনে যে আনন্দ ও উচ্ছাসের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এবং মিসরে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই সংগঠন হুমকি বলে যেসব সংবাদ ছাপানো হয়েছে তা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে জেমস হেওয়ারেস জন কর্তক রচিত “আধুনিক মিসরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা” শীর্ষক উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, যায়নবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট এই সংগঠনের গুরুত্ব অত্যধিক। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত আমার ‘ইসলামের সামাজিক ন্যায়নীতি’ বইটি ঐ সমস্ত যুবকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছি যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়েজিত রয়েছে। উক্ত বই প্রকাশের পর ইখওয়ানরা মনে করেছে বইটি ইখওয়ানের কর্মীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। তারা নিজেরাই এই বইকে তাদের চিন্তার ফসল ও লেখককে তাদের ঘনিষ্টজন

মনে করল। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে আমি আমেরিকা থেকে ফেরার পর ইখওয়ান কর্মীরা উক্ত বই নিয়ে আমার সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছে।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই সংঘটিত সেনা অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত আমি কোন নির্দিষ্ট দলে যোগ না দিয়ে তৎকালীন বিরাজমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা, জমিদারী ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরে দু’টি বই লিখেছি এবং শত শত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছি, যেগুলো সমাজতান্ত্রিক ও জাতিয়তাবাদী দলের পত্রিকাসমূহে এবং ‘আদ-দাওয়াহ’ ও ‘আর-রেসালাহ’ ম্যাগাজিন সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও

সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত ২৩ শে জুলাইয়ের বিপ্লবীদের সাথে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এরপর “হাইআতুত তাহরীর” গঠনসহ বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়ায় উক্ত সম্পর্কে ফাটল ধরে। এর মধ্যে ইখওয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। কারণ আমি মনে করতাম এই অঞ্চলে বিস্তর পরিসরে ইসলামের খেদমত করা ইখওয়ানে যোগদান ব্যতীত সম্ভব নয় এবং আমেরিকা থাকাকালীন সময়ে এই ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, একমাত্র ইখওয়ানই সাম্রাজ্যবাদী, ক্রুসেডার ও যায়নবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারে। এসব কারণে ১৯৫৩ সালে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে ইখওয়ানে যোগদান করি।

ইখওয়ানের সদস্যরা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে গ্রহণ করলেও প্রথমে আমার কার্যক্রম লেখালেখি, বক্তৃতা, পত্র লিখন ও পত্রিকা সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৫৪ সালের জানুয়ারির ঘটনায় আমি বন্দি হই। মার্চে মুক্তি পাই। এরপর ২৬অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনার পর বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাতে আমাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। যে অভিযোগে আমি দশ বছর কারাবরণ করেছি তা থেকে নিজেকে এখন নির্দোষ প্রমাণ করে কোন লাভ নেই। কারণ, আমিতো সেজন্য জেল কেটে ফেলেছি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ স্পষ্ট হওয়ার জন্য তা প্রমাণ করা একাস্ত প্রয়েজন হয়ে পড়েছে। এখনে প্রাসংগিকভাবে ১৯৫৪ সালে সংঘটিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটির বর্ণনা এবং আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনার বর্ণনাও এসে যায়।

আশা করি পাঠকরা এই ঘটনাকে কোন অপ্রসাংগিক ও অপ্রয়েজনীয় ঘটনা মনে না করে মনযোগ সহকারে শুনবেন। কারণ, সামনের ঘটনাসমূহের সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মিসরের সমাজ কল্যাণমন্ত্রী ড. আহমদ হুসাইন ১৯৫১ সালে আমেরিকা সফর করেন। তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে মিসরে ফিরে আসেন। নুহাস পাশার সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে

তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। অতঃপর কৃষক-শ্রমিকদের সামাজিক অধিকার আদায়ের নামে ‘কৃষক ফোরাম’ নামে একটি সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। সে সময় মার্কিন মিডিয়া উক্ত সংস্থার এবং তার প্রতিষ্ঠাতার এমন ভূয়সী প্রসংশা করেছে যে, তাতে প্রকারন্তরে সংস্থার সাথে মার্কিনীদের গোপন আতাত ধরা পড়ে যায়। সে সংস্থায় ড. আহমদ হুসাইন এবং এর নেতৃত্বে তার চেয়েও অনেক নামি-দামি ব্যক্তিরা পর্যন্ত যোগদান করেছিল। যেমন- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, শিক্ষামন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক ও

শাইখ বাকুরী প্রমুখ। সে সময় ইখওয়ান ও সেনা-বিপ্লবীদের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলছিল। আমি তা জানতাম, কারণ আমি দিনে বার ঘন্টা বিপ্লবীদের সাথে থাকতাম। এখানে উল্লেখ্য যে, উস্তাদ ফূয়াদ জালাল প্রেসিডেন্ট নজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিল। তিনি কৃষক ফোরামের সদস্য ও দায়িত্বশীল ছিলেন। আমি লক্ষ্য করতাম, তিনি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ইখওয়ান ও বিপ্লবীদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধকে উসকে দিতেন। তিনি আমাকে বিপ্লবীদের আপনজন ও ঘনিষ্টজন মনে করতেন। তাই আমার সামনেও সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আমি সর্বদা উস্তাদ ফুয়াদ জালাল ও মার্কিন ইন্ধনে প্রতিষ্ঠিত ‘কৃষক ফোরাম’ ইখওয়ান ও বিপ্লবীদের মাঝে বিরোধের যে খোরাক যোগাত তা স্তব্ধ করার প্রচেষ্টায় থাকতাম। কিন্তু পরিশেষে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

এখানে প্রশ্ন জাগে, আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক রয়েছে কি? হ্যাঁ অবশ্যই। এই ঘটনাটি ঘটার পর আমি নিশ্চিত হই যে, এটি কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়; বরং এটি উভয় গ্রুপের মধ্যে সাপে নেউলে সম্পর্ক সৃষ্টি করে বাইরের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ষড়যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। এরপর আমি আরো নিশ্চিত হলাম যে, উস্তাদ জালাল ও কৃষক ফোরাম বস্তুত আমেরিকার স্বার্থের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৫৪ সালে সামরিক কারাগারে সায়্যিদ সালাহ্ দসুকী এই ঘটনার ব্যাপারে আমার মত জানতে চাইলে আমি এর পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত জানিয়ে ছিলাম তাকে। তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এই ঘটনাকে একটি সাজানো নাটক বলে মনে করেন? আমি বললাম, আমি নাটক বলছি না; বরং আমি বলছি বিদেশীদের ইন্ধনে এই ঘটনাটি হয়েছে। তখন তিনি বললেন, যা হোক ইখওয়ানরা এই ঘটনার সাতে অবশ্যই জড়িত।

এখন আমি ১৯৫৪ সালের পর আমার তৎপরতার বিবরণ দিচ্ছি। আমি নিশ্চিত হলাম যে, আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনা একটি পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। তাই ১৯৫৫ সালে তাররা কারাগারে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল সবার থেকে এই ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। বিশেষত আব্দুল লতিফ যার পিস্তল থেকে গুলি বের হয়েছিল এবং হিন্দাভী দুরাইদ থেকেও জিজ্ঞাসা করলে তারা

বলেছিল, বিষয়টি রহস্যজনক। অন্যরা বলেছিলেন, এটি একটি গোপন বিষয় যা জানা এখন সম্ভব নয়। এসব উত্তরে আমি সন্তষ্ট হতে পারেনি।

এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল যে, যায়নবাদী, ক্রুসেডার ও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইখওয়ানকে ধ্বংসের পথে নেমেছে। এমতাবস্থায় আমি প্রয়েজন অনুভব করলাম ইখওয়ানকে আপন

কক্ষ পথে ফিরিয়ে আনতে হলে ঐসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে হবে।

আমি মনে মনে এই ভেবে অনুতপ্ত হতাম যে, এই সাজানো ঘটনার কারণে হাজার হাজার মানুষ নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। এই ঘটনাটি যে বাইরের ইন্ধনে হয়েছে- তা সে সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ভাষ্য থেকেও জানা যায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম যে, ইখওয়ানের যাত্রা ব্যাহত হবার কারণে মিসরের নৈতিক অধঃপতন ও ধর্মদ্রোহিতার স্রোত বেগবান হচ্ছে। এই আন্দোলনের স্রোতের মুখে একটি প্রাচীরের মত ছিল৷ সুতরাং সেটা ভেঙ্গে ফেলা হলে বাঁধভাঙ্গা স্রোত তার নিজ গতিতে প্রবাহিত হল। আমি কারাগারেও এসব শুনতাম। মুক্তি পেয়ে দেখলাম, যা শুনেছি তার চাইতে বাস্তবতা আরো ভয়াবহ। গোটা মিসরী সমাজ পাশ্চাত্য সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এই বিষয়টি স্বাভাবিক নয়; বরং অস্বাভাবিক একটি বিষয়। এটা যায়নবাদী, ক্রুসেডার ও সাম্রাজ্যবাদীদের ঐসব ষড়যন্ত্রের অংশ যা তারা প্রণয়ন করেছে মিসরীয়দের পঙ্গু করার জন্য। যাতে তাদের হাতে অস্ত্র থাকলেও তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এটা স্বতসিদ্ধ যে, মানুষের ব্যবহারে অস্ত্রের কারিশমা ফুটে উঠে। অস্ত্রের কারণে মানুষের বীরত্বের প্রকাশ পায়না। মানুষ নৈতিক ও আদর্শগত ভাবে দেওয়ালিয়া হলে তাদের মূল্য হবে স্রোতের ফেনার মত। ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করার কারণে সৃষ্ট সেই অধঃপতিত অবস্থা যে কেউ আঁচ করতে পারে। যেমন এইকথাও কারো অজানা নয় যে, যায়নবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কারণেই ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য করার নিমিত্তে আমি ইখওয়ানে যোগদান করি।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত উক্ত আন্দোলনের রীতি- নীতি নিয়ে চিন্তা করে কাজ শুরু করি। এরপর উক্ত সংগঠনের

সাথে আমার সম্পৃক্ততার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। যা পরে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

বিঃ দ্রঃ আলেকজেন্দ্রিয়া ঘটনার সাথে অন্য একটি ঘটনার কথাও মনে পড়েছে। যেটি ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে ১৯৬২ সালে আন্দোলনকে পুনঃগঠন করার কথা মুলতবী করে আগে সেই ঘটনাটি বর্ণনা করছি।

**************

তাররাঃ নিন্দিত এক কসাইখানা

আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনার পর হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মী জেল-জুলুম দেশান্তরসহ নানা দুঃসহ অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে। তাদের পরিবার-পরিজন পর্যন্ত সে নির্যাতনের নগ্ন খড়ক থেকে রক্ষা পায় নি। এররপর দেখেছি কারাবন্দীদেরকে নির্বিচারে পাইকারীভাবে হত্যা করার জন্য আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনার মত বিভিন্ন ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়েছে।

১৯৫৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে ইখওয়ানের কর্মীরা তিন কারাগারে বিভক্ত ছিল। যথাঃ লিমোনতাররা, যেখানে ৪০০ মত বন্দী ছিল। মিসরী কারাগার এখানেও ৪০০ মত বন্দী ছিল ও সামরিক কারাগার। সেখানে দুই হাজার মত বন্দী ছিল যাদেরকে বিচারে মুখামুখীও করা হয়নি। তাররা কারাগারে অনেক সাবেক সামরিক অফিসারও ছিল। যেমন- ফূয়াদ জাছের হুসাইন মাহমুদা, আব্দুল করীম আতিয়্যা ও জামাল রবী। আর সামরিক কারাগারে ছিল মারুফ হুদরী ও অন্যান্যরা। জামাল র’বী জেল থেকে মুক্তিলাভের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তাহলো, তিন কারাগারে বন্দী ইখওয়ান কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তি প্রয়োগ করে পাহারারত সৈন্যদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বের হয়ে অন্যান্য কর্মীদের সাথে মিলিত হবে। আর এই সামরিক পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করেন।

তিনি এই প্রস্তাবটি ফূয়াদ জাছের ও হুসাইন মাহমুদার কাছে পেশ করলে উভয় তা নাকচ করে দেয়। এরপর উস্তাদ সালেহ আবু রফিকের কাছে পেশ করার পর তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, ইখওয়ানের পঞ্চাশ জন কর্মী আমার এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। আমি সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এই প্রস্তাবটিকে একটি আত্মহত্যামূলক ও নিজ পায়ে কুড়াল মারার মত মনে করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে মুক্তির পথ নির্ধারণ ও তার প্রস্তাবের ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন।

সে সময় আমি তাররা কারাগারে বন্দি ছিলাম। এখনো আমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা হয়নি। সেখান থেকে পরে সামরিক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৫৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী আমি ভীষণ অসুস্থ হই। আমাকে চিকিৎসার জন্য লিমান তাররার কারা হাসপাতালে স্থানাস্তর করা হয়। এপ্রিলে আমি সুস্থ হলে আমাকে বিচারের জন্য সামরিক কারগারে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত হয়। সে সময় জামাল রবী আমার কাছে এসে বললেন, আপনি সেখানে যাবার পর আমার এই প্রস্তাবটি মারূফ হাদরীর কাছে পেশ করবেন। আমি অপরাগ অবস্থায় প্রস্তাবটি মারুফ হাদরীর কাছে পেশ করলে সে প্রস্তাবকারীর নাম জানার প্রয়োজনবোধ না করে

বলতে লাগলঃ এটি কারারুদ্ধ ও বাইরে অবস্থানরত ইখওয়ানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালোনোর এক গণ্ভীর ষড়যন্ত্র। অতঃপর সে প্রশ্ন করল, প্রস্তাবকারী কে? উত্তরে বললাম, জামাল রবী ৷ আমি জানতাম তারা উভয়ে বন্ধু এবং উভয় একই ঘর থেকে বন্দী হয়েছে। তখন সে বলল, জামালকে এসব বলবেন না।

এরপর আমি তাররা কারাগারে ফিরে এসে জামালকে মারুফের মতামত জানালাম। কিন্তু তিনি আগের মত তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যস্ত রইলো। সে সময় তাররা কারাগারের প্রধান ছিলেন আব্দুল বাসেত বান্না। তিনি ইতিপূর্বে আমাকে হাসপাতালে দেখতে যেতেন এবং ইখওয়ান বন্দীদের মুক্তির-পথ নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন, বন্দীরা মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। বিশেষত যারা তাররা পাহাড়ের পাথরসীমা অতিক্রম করবে। যদিও আমি জানতাম তিনি তার ভাই হাসানুল বান্নার জীবদ্দশায় ইখওয়ানের কর্মী ছিলেন না। তারপরও আমি বললাম, কি করা যায়? তিনি বললেন, আমি নিজে এবং আমার অধিনস্থদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আপনদেরকে দিয়ে দেব।

তখন জামাল রবীর পরিকল্পনা ও মারুফ হুদরীর উক্তি আমার কানে ঝংকৃত হল। তখন আমি বললাম, আপনার আবেগে আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমরা মনে করি, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন আমাদের করার কিছু নেই। এরপর তার আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। পরে তিনি অন্যত্র বদলী হয়ে যান। ইতিমধ্যে জামাল রবীসহ ইখওয়ানের অন্যান্য উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদেরকে তাররা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। ইখওয়ানদের হত্যা করার এই প্রচেষ্টা সফলতার সুখ দেখেনি। কিন্তু ১৯৫৭ সালে নিমান তাররায় অন্য একটি নির্মম ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি হল- সেখানে আব্দুল্লাহ মাহের নামের এক দারোগা ছিল। তার সাথে কারাগারে আটক পাঁচ ইহুদী যুবকদের সাথে মধুর সম্পর্ক ছিল। এই দারোগা ইখওয়ানদেরকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে লিমানের পাহারাদার ও ইখওয়ানদের মাঝে টান টান উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। উক্ত দারোগার সাথে অন্য একজন দারোগা মিলে বিষয়টিকে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাতের পর্যায়ে নিয়ে যায়। উস্তাদ মুনীর যুবকদের পক্ষে না থাকায় তাঁদের কোন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নেতা ছিল না। এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরে কিছু ইখওয়ানদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টি সাময়িক ভাবে নিষ্পত্তি হয়। এরপরও আব্দুল্লাহ্ মাহের উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ইখওয়ানদের

ক্ষেপিয়ে ভুলতে থাকে। এর মধ্যে একদিন ইখওয়ানরা জানল যে; যাদেরকে পাহাড়ে নেওয়া হয় তাদের বিরুদ্ধে পলায়ন ও অবাধ্যতার অভিযোগ তুলে হত্যা করা হয়। তারা এর প্রতিবাদ জানাতে কারা প্রকোষ্টে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সৈন্যদেরকে সেখানে প্রবেশ করে ব্রাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ঘটনাস্থলে ১১ জন কর্মী শহীদ হয় অপর ২১ জন আহত হয়।

এরা প্রকৃতপক্ষে অবাধ্য হলেও অন্য যে কোন পন্থায় তাদেরকে শায়েস্তা

করা সম্ভব ছিল। যেমন শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে বের করে আনা, দরজা বন্ধ করে ২৪ ঘন্টা খাদ্য পানীয় সরবরাহ ছিন্ন করা ইত্যাদি। তখন তারা আত্মসর্ম্পণ করত। কিন্তু যে বর্বর পন্থায় তাদেরকে শায়েস্তা করা হল তা এই ইংগিত বহন করে যে এর পিছনে অদৃশ্য শক্তি রয়েছে। যে শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হল নানামুখী নির্যাতন চালিয়ে ইখওয়ানের কর্মীদেরকে হত্যা করা এবং এর মাধ্যমে আন্দোলনকে দূর্বল করে তাদের লক্ষ্য অর্জন করা।

তাররার এই হত্যাকন্ডের পর সালাহ দসুকী তদন্তে আসেন। তিনি ঘটনার তদস্ত করে ইথওয়ানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এখানে মূল ঘটনার চেয়ে আমাদেরকে ঐ ঘটনা পরম্পরাকে মূল্যায়ন করতে হবে- যার প্রেক্ষিতে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে এবং সেই অনুভূতিকে মূল্যায়ন করতে হবে যাতে জানতে পেরেছি ষড়যন্ত্রসমূহ ইখওয়ানের বিরুদ্ধে প্রণীত হয়েছে, ইখওয়ানের পক্ষ থেকে নয়।

* * *

ইসলামী আন্দোলনঃ

অভিযান যেখানে মূল থেকে শুরু হয়

এখন আমি ঐতিহাসিক সময়রেখা অনুযায়ী ঘটনা বর্ণনা করছি। নিম্নোক্ত পয়েন্টসমূহ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করছি। কারণ এগুলোই পরবর্তী নতুন ঘটনার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। মিসরে ইখওয়ানের উপস্থিতি ও এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম। কিন্ত যায়নবাদী, ক্রুসেডার ও সাম্রাজ্যবাদীরা এই আন্দোলনের বিনাশ কামনা করে। তাদের বই পুস্তক ও কার্যক্রম থেকে এটাই প্রতিভাত হয়। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ইসলামী আকীদাকে দূর্বল করা ও ইসলামী নৈতিকতা নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং ইসলামকে ক্ষমতার চালিকা শক্তি থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে মুসলিম সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাতে অধঃপতন সৃষ্টি করার জন্য প্রণোদিত। ইখওয়ান নিষিদ্ধ হবার পর তাদের পরিকল্পনা অনেকটা বাস্তবায়িত হয়েছিল। মিসরে অনৈতিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়া ও

তাররার সাজানো ঘটনা অনেক ইখওয়ানের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। কৃষক ফোরাম বিপ্লবীদেরকে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে এক নাজুক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। হত্যা, নির্যাতন ও দেশান্তরসহ নানা ভীবৎস অত্যাচার সহ্য করেছিল ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনরা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতাই সচিঞ্চত হয়েছিল আমার ভান্ডারে। এতে ইখওয়ানেরও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। নিশ্চয় ইসলামী

আন্দোলনের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপকে নিষ্ঠুরতা বলে গণ্য করা হবে। ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে অভিজ্ঞতার পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

তররা হত্যাকান্ডের পর লিমানে আমার সাথে ইখওয়ানের ইউসুফ হাওয়াশ ও মুহাম্মদ জাহদী ব্যতীত কেউ ছিল না। পরবর্তীতে দ্বিতীয় জনও পৃথক হয়ে যায়। ফলে হাওয়াশ ব্যতীত আর কেউ ছিলনা।

ইখওয়ান সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণার পর এবং আন্দোলনকে ইসলামের প্রথম আন্দোলনের সাথে তুলনা করার পর আমার সামনে স্পষ্ট হল যে, ইসলামের সূচনাতে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সমস্ত মানবগোষ্টী ইসলামের বিরোধীতা করেছিল অনুরূপ আজ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধেও সমস্ত অশুভ শক্তি ঐক্যবদ্ধ। তারা বিভিন্ন কুটিল ষড়যন্ত্র করে ইসলামী আন্দোলনের অকাল মৃত্যুর প্রহর গুনছে এবং এই লক্ষ্যে দেশীয় ব্যবস্থা ও উপকরণকে ব্যবহার করছে। এই কারণে ইসলামী আন্দোলন সমূহে অধিকাংশ সময় দেশীয় রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত থাকতে হয়। ইসলামী আন্দোলন দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলে। অথচ তারা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মহল ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত। তাই ইসলামী আন্দোলন সমূহকে এক অভিন্ন মূলনীতি নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহল প্রথমে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে ইসলামের বীজবপন করা, যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে ইসলামী ভাবাদর্শে আদর্শে আদর্শবান করা। প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সময় ব্যয় না করা এবং সমস্ত মানুষের অন্তর ইসলামী হুকুম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত না করা পর্যন্ত ক্ষমতার জন্য শক্তি ব্যবহার না করা অত্যাবশ্যকীয়। সাথে সাথে বর্হিশক্তির আক্রোশ থেকে আন্দোলনকে রক্ষা করতে হবে এবং আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও তাদের পরিবার যেন শত্রুর কাছে অত্যাচারিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন-অত্যচার হয়েছিল ১৯৪৮, ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালে ইখওয়ানদের উপর এবং অন্যান্য দেশেও হচ্ছে বলে শুনা যায়। যেমন- পাকিস্তানে জমায়াতে ইসলামীর উপরও হয়েছে। নিঃসন্দেহ এটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ। এই আত্মরক্ষা সম্ভব হবে কর্মীদের থেকে তরবিয়ত প্রাপ্ত একটি আত্মোতসর্গকারী দল সৃষ্টির মাধ্যমে। যারা প্রথমে অন্যায় করবে না ও দেশীয় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করবে না। অনেক সময় আন্দোলন শান্তভাবে চলতে পারে। শত্রুর অত্যাচারের মুখোষমুখী না হয়ে স্থীরভাবে অগ্রসর হতে পারে। তারা শুধুমাত্র আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হলে তা প্রতিহত করবে। তাদের উপর জুলুম করা হলে তার

প্রতিরোধ করবে। এই কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামী হুকুমত তড়িৎ গতিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; বরং গোটা সমাজকে ইসলামী রংয়ে রঙ্গিন করার পর প্রতিটি সদস্যকে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান করার পর ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এর জন্যে প্রয়োজনে যত সময় লাগে, লাগুক। হাওয়াশ ও

আমি ইসলামী আন্দোলনকে এই মাপকাঠিতে মেপেছি। এরপর এই ভাবটা অন্যান্য ইখওয়ানদের মধ্যে প্রচার করি। যাতে আন্দোলন মূল শিখড় থেকেই তার দায়িত্ব পালন করতে পারে। ফলে ১৯৬২ সাল থেকে আন্দোলনের মূল কাজ শুরু হয়। আমি এই নব যাত্রা শুরু করি কিছু বন্দী ইখওয়ানের উপস্থিতিতে৷ যাদের অধিকাংশ কানাতের ও অল্প সংখ্যক ওয়াহাত কারাগার থেকে চিকিৎসার জন্য লিমন তাররা ও মিসরী কারাগারের হাসপাতালে এসেছিল। আমি হাসপাতালের বারান্দায় ও অন্য সুযোগে তাদের সাথে মিলিত হতাম। তারা চিকিৎসা শেষে তাদের কারাগারে ফিরে যেত। ফলে তাদের সাথে মিলনের সময়টা খুব স্বল্প। অন্যান্যদের সাথে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে যার বিবরণ আমি তুলে ধরব। এরপূর্বে ঐ পরিবেশ চিত্রায়ন করা আবশ্যক মনে করছি, যে পরিবেশে আমি তাদের সামনে আমার চিন্তাধারাটি তুলে ধরেছি।

এখনো আমি ইখওয়ানের পরিবেশে একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে পরিচিত। তবে একজন ইসলামী লেখক হিসেবে এবং মুসলিম বিশ্বে আমার সুঅবস্থানের দারুন তারা আমাকে মূল্যায়ন করল। কিন্তু আমি ইখওয়ান পরিচালনার এমন কোন সদস্য ছিলাম না যে আন্দোলন পরিচালনার রূপরেখা অংকন করতে পারে। কারণ ইখওয়ানে এই অধিকার একমাত্র মুর্শিদে আম তথা প্রধান পথনির্দেশক ও তার নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে থাকে। আমি তেমন কেউ ছিলাম না। তাই আমি সতর্কতার সাথে পা বাড়ালাম। যুবক কর্মীদের বুঝালাম ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগের পূর্বে ইসলামী আক্বীদার কথা প্রচার করতে হবে। প্রচলিত দেশীয় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সময় ব্যয় না করে সমাজের সদস্যদেরকে ইসলামী দীক্ষা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, আজ সমস্ত মানব সমাজ মুসলিম সমাজও ইসলামের প্রাথমিক যুগের সমকালীন সমাজের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সে সময় ইসলাম প্রথমে নিয়ম-নীতি প্রচারের পূর্বে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করেছিল। তাই আজ ইসলামী আন্দোলনকে সেই পয়েন্টকে পুঁজি করে সামনে চলতে হবে।

এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ আয়ত্ব করার পর্যাপ্ত সময় তাদের প্রত্যেকের ছিল না। কিন্তু এর দ্বারা তাদের সামনে ভাবনার নতুন জগত সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বিষয়ে কিতাব-পত্র পড়ার আগ্রহ জন্মাল। বইগুলোর নাম আমি তাদের বলে দিয়েছি। তন্মধ্যে কিছু কিতাব লিমানে আমার কাছে ছিল। তারা এখানে কিছু পড়ে বাকীটি পরবর্তীতে শেষ করত। তারা প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে পরে সমষ্টিকভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করত। ১৯৬২ সালে কানাতির কারাগারের মোস্তফা কামেল, সৈয়দ ঈদ ও ইউসুফ কামেলকে নিয়ে গঠিত একটি দলের সাথে এই বিষয়ে এক সপ্তাহ আমি আলোচনা করি। এই সিদ্ধান্তটি শুনে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। কেউ কেউ এই বিশয়ে

আরো জানতে চাইল। আর কেউ এই পদ্ধতিটি আন্দোলনের পূর্বনীতির বিপরীত হওয়ায় এর স্পষ্ট বিরোধিতা করল।

১৯৬২ ইং থেকে ১৯৬৪ ইংরেজী পর্যন্ত ইখওয়ানের বিভিন্ন দল এই বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করেছে। তাদের মধ্যে থেকে যাদের নাম আমার স্মরণ আছে তাদের নাম উল্লেখ করছি। তবে সে সময় কানাতেরে উপস্থিত যে কোন কর্মী থেকে বা রেজিস্ট্রি খাতা থেকে খুব সহজে সবার নাম জানা যাবে। যাদের নাম আমার মনে আছে তারা হল- রিফআত, ছইআদ, আব্দুল হামীদ মাদী, সাইদ মুন্সী, আবদুহু ছালেহ, ফাওজী নজম, আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক, আমানুল্লাহ, মোস্তফা দিআত, সায়্যিদ দুসুকী, মুসা জাবীছ, ছবয়ী আনতর, মাহমুদ হামেদ, রুশদী আফীফী, আব্দুস সালাম আমরোহ, আব্দুর রউফ কামেল, সায়্যিদ রজব, ছা’আদ আফীফী, হাছান আব্দুল আজীম, ছালাহুল আনওয়ার প্রমুখ।

বিঃ দ্রঃ নাম বর্ণনা করা আমার জন্য কষ্টকর এবং তা বর্ণনার জন্য দ্বীর্ঘ সময়ের দরকার। সবার নাম উল্লেখ করলে দুই ঘন্টা মত লাগবে অথচ তা বর্ণনা করে কোন লাভ নেই। এটা ভাই হাওয়াশ, তুখী বা অন্য কোন তখনকার উপস্থিত ব্যক্তির মাধ্যমে জানা যেতে পারে। এতে আমি এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে পারবো। আর তা হল তাদের সাথে আমার সম্পর্কের ধরন এবং ইখওয়ানের পক্ষ-বিপক্ষের পারস্পরিক আচরণ।

কানাতের থেকে আগত যেসব ইখওয়ান আমার এই নতুন পদ্ধতির কথা শুনেছে তারা সবাই একই বয়স ও একই জ্ঞানের অধিকারী ছিল না। তাদের কিছু ছিল শ্রমিক আর কিছু ছিল বিভিন্ন স্তরের ছাত্র। উপরন্তু তাদের কেউ আমার সাথে এক ঘন্টা আর কেউ দু’ঘন্টা আর কেউ কয়েক সপ্তাহ আর কেউ একমাস ছিল। তাই তারা কানাতেরে আমার পক্ষ থেকে যে পয়গাম নিয়ে গেছে তার রূপও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ফলে সেখানকার ইখওয়ানের দায়িত্বশীলরা আমার কাছে এই বিষয়ের কিতাবের তালিকা চাইল। কারণ, যে কোন বিষয়ের কিতাব সে বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে। আমি চল্লিশটি কিতাবের নাম দিলাম। তারা এখান থেকে কিছু এবং নিজেদের থেকে কিছু বই নির্বাচন করে কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী তাদের পাঠ্যভুক্ত করল।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কানাতেরে অবস্থিত ইখওয়ানরা তিনভাগে বিভক্ত হল। ৫০ জন আমার পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছে ২৩ জন প্রত্যাখ্যান করেছে আর ৫০ জন নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। এভাবে চলতে চলতে ১৯৬৫ সালে সবাই মুক্তি পায়।

যারা আমার সাথে একমত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-মোস্তফা কামেল, রিফআত ছায়াদ, সৈয়দ ঈদ, ফউজী নজম, তুখী, ছবরী আনতর, আব্দুল হামীদ, অন্যান্যদের নাম আমার স্মরণ নেই। হাওয়াশ, তুখী ও ফউজী নজম তাদের সবাইকে চিনে।

যারা আমার বিরোধিতা করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আমীন ছিদ্কী, আব্দুর রহমান বান্নান, লুতফী সলীম, আব্দুল আজীজ জালাল। অন্যান্যদের নাম তুখী, ফউজী নজম ও মোস্তফা কামেলের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

বিরোধীরা উক্ত মতবিরোধ ও আমার অভিমতকে বড় এবং বিকৃতি করে ওয়াহাতে অবস্থানরত ইখওয়ানদের কাছে পৌঁছায়েছে। ফলে তারা এই ব্যাপারে চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছে।

সেখানকার ইখওয়ান কর্মী আব্দুর রউফ চিকিৎসার জন্য তাররায় এসে আমাকে যুগপৎভাবে সংবাদ দিল যে, ওয়াহাতের কর্মীরা এই ব্যাপারে অস্বস্তি প্রকাশ করেছে এবং তারা কাউকে কাফের বলতে প্রস্তুত নয়।

আমি তাকে বললাম, আমরা কাউকে কাফের বলেনি; বরং আমরা বলি যে, বর্তমান সমাজ ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও জীবন-বিধান সম্পর্ক না ওয়াকেফ হওয়ায় জাহেলী সমাজের মত হয়ে গেছে। তাই ইসলামী আন্দোলনের উচিত প্রথমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার রব না তুলে ইসলামী আক্বীদা ও দীক্ষা বিস্তারের রব তোলা। ফলে বিষয়টি কারো ব্যাপারে কিছু বলার চেয়ে ইসলামী আন্দোলনের কারিকুলামের সাথে বেশী সম্পর্ক রাখে।

সে ফিরে গিয়ে সাধ্যমত তাদের কাছে আমার বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেখানকার বিরোধী ইখওয়ানরা এটাকে আন্দোলনে গ্রুপিং সৃষ্টির পাঁয়তারা বলে প্রচার করেছে। একসময় সেখানে বন্দি ইখওয়ান পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দুল আজীজ আতিয়্যা ও ওমর তেলমেসানী তাররা হাসপাতালে আসেন। আমি উভয়ের সাথে সাক্ষাৎকার তাদের সামনে আমার বক্তব্য ভালভাবে তুলে ধরলাম। তারা উভয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছে। আমীন সিদ্কী ও আব্দুর রহমান বান্নান তাররা হাসপাতালে আসার পর হাওয়াশ উভয়কে বুঝালো যে, বিষয়টি তারা যেভাবে আমলে নিয়েছে সে রকম নয়। উল্লেখ্য, তখন আমার বুকে অপারেশন জনিত অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আমি হাসপাতালের বাইরে ছিলাম। কিন্তু তারা কানাতেরে ফিরে গিয়ে পূর্বের অবস্থানে অটল থাকে। এই অবস্থায়ই তারা মুক্তি লাভ করে। আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দীর্ঘ আটমাস কায়রো থাকাকালে আমার সাথে ঐক্যমত পোষণকারীরা আমার সাথে বারবার সাক্ষাৎ করেছিল। মোস্তফা কামেল একবার, রিফআত ফুয়াদ পাঁচ বা ছয় বার, সৈয়দ ঈদ দশাধিক বার, ফউজী নজম তিনবার, তুখী তিনবার, সৈয়দ দসুকী তিন বা চারবার এবং অন্যান্যরাও সাক্ষাৎ করেছিল। হাওয়াশের সাথে আমার বেশী সম্পর্ক ছিল। কারণ তার সাথে দশ বছর কেটেছি এবং উভয়ই এই কারিকুলাম সম্পর্কে চিন্তা করে ঐক্যমত্যে পৌছেছি। তাকে আমি কানাতের থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ইখওয়ানদের মধ্যে এই চিন্তা-ভাবনার পূর্ণতা দানের এবং নতুন সংঘঠনের সমন্বয়কারীর দায়িত্বের জন্য মনে মনে মনোনীত করেছিলাম। কিন্তু তা পরিপূর্ণ হয়নি। নিম্মোক্ত কিছু কারণে কারামুক্তি প্রাপ্তদের জন্য বিশেষত আমার সাথে ঐক্যমত পোষণকারী ২৫ জন যুবক বিশিষ্ট প্রথম দলকে নিয়ে কোন সংগঠন গঠিত হয়নি।

সেগুলো হল-

(১) এই সংগঠনকে তখনকার ইখওয়ানের মত একটি দল বলে গণ্য করা হবে এবং আমি এক্ষেত্রে এখনো চিন্তার ক্ষেত্র অতিক্রম করেনি। উপরন্তু তখন আমি নতুন কোন সমস্যায় নিজেকে জড়িত করতে রাজী ছিলাম না।

(২) দীর্ঘ দশ বছর কারাগারে অবস্থানকারীরা সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অন্ধের মত অজ্ঞ। তাদেরকে সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি জানার সুযোগ প্রদানকরা একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু তখন সরকারের পক্ষ থেকে তাদের গতিবিধি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল ।

(৩) জেলখানার ও বাহিরের পরিবেশের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। করাজীবনে নিজ মতবাদের প্রতি বন্দীর অগাধ ভালবাসা জন্মে। কিন্তু বাহিরে সে বিভিন্ন কর্মব্যস্ততায় নিয়োজিত থাকে বিধায় সেই মতবাদের প্রতি পূর্বের ভালবাসা থাকেনা। ফলে এদেরকে পরীক্ষার জন্য কিছু সময় ছেড়ে দেয়া অবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

এসব কারণে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করার বিষয়ে কেউ কথা তুললে বা আমার অনুপস্থিতিতে এই বিষয়ে কারাগারে দায়িত্বশীল পাঁচ যুবকদের কেউ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তড়িৎ উত্তর দিতাম না। আমাকে প্রশ্ন করা হত অমুক মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি মত? কেন তারা সবাই আমাদের সাথে মিলিত হচ্ছে না? একবার তাদেরকে বললাম, আমরা মুক্তি প্রাপ্তদেরকে ছয় মাস তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেব। ভাই হাওয়াশ তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। কিন্তু এসব কিছুই বাস্তবতার মুখ দেখেনি। তাদের অবস্থা জানার জন্য আমি ভাই তুখীকে ডেকে ছিলাম। কারণ ওদের সাথে তুখীর ভাল সম্পর্ক ছিল এবং আমিও তাকে অত্যধিক বিশ্বাস করতাম।

আমার এখনো যনে পড়ছে, আমি ভাই উসমাবীদের সাথে থাকাকালে সে উপস্থিত হয়েছিল। আমার ভাই মুহাম্মদ কুতুব তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে ডেকে নিল। আমি তার সাথে বসলাম। অতঃপর উসমাবীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, তার তাড়া রয়েছে। তাই সংক্ষেপে প্রয়োজন সারলাম।

সে সময় ভাই তুখী ইসমাইলিয়্যার এজেন্ট অফিসে কাজ করত। সে কানাতেরে ইখওয়ানের দায়িত্বশীল ছিল বিধায় বা অন্য কোন কারণে ইসমাঈলিয়্যার গোয়েন্দারা তার কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করত। সে রাত্রে সেখানে উপস্থিত হয়ে সকালে অফিস করত। আমার কাছে তার উপস্থিত হওয়াটা কেউ পছন্দ করত না। অথচ কানাতের থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের খবর জানতে তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে অল্প সময়ের জন্য আমার কাছে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বিবরণ দিল। আমি উপস্থিত পাঁচজনকে এই বিষয়ে দ্রুত অবহিত করলাম। কারণ, আমার ভাই মুহাম্মদ কুতুব আমাকে কানে কানে সংবাদ দিল যে, সে আবারো আমার সাথে দেখা করতে

চায় আর আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম।

বিঃ দ্রঃ কোন মেহমান বা আমার পরিবারের কোন সদস্য আমার সাথে দেখা করতে চাইলে প্রথমে চুপেস্বরে আমাকে বলত, জোরে বলত না। আর মুহাম্মদ কুতুব তুখীকে চিনত না এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না। ভাই তুখীর কাছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা ব্যতীত আমি তাদেরকে সমন্বয় করার অন্য কোন পদক্ষেপ নেই নি। কিন্তু তুখী থেকে আমি শুনেছি তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ষে, তারা দু’দুজন করে পাশাপাশি এলাকায় অবস্থান করে অবশিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। যাতে উপযুক্ত সময়ে সংগঠিত হওয়া সহজ হয়। আমি বললাম, এটা যথেষ্ট হবে। এই রকমই ছিল জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্তদের অবস্থা। আমি জানি না এই পদক্ষেপটা কি তারা নিজেরাই নিয়েছে নাকি কেন্দ্রীয় অফিস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আমার প্রবল ধারণা যে, এটা তারা নিজেরাই নিয়েছে। কারণ, এই পদক্ষেপে সবাই জড়িত ছিল না; বরং যারা সচেতন তারাই মাত্র জড়িত ছিল। আমি মনে করি সে সময়ে এই পদক্ষেপটি যথোপযুক্ত ছিল। কারণ, তখন মুক্তি প্রাপ্তদেরকে তড়িৎ সংগঠিত করা সাময়িকভাবে অসম্ভব ছিল। অন্য দিকে আমি হাওয়াশ ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ মানুষকে, কোন ইখওয়ান কর্মীকে, এমনকি মুক্তিপ্রাপ্তদের কাউকে এই নতুন সংগঠন সম্পর্কে কিছুই বলিনি।

* * *

সম্পদ ও অস্ত্রের সন্ধানেঃ
নতুন সংগঠন

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে ইসলামী আন্দোলনের একটি রূপরেখা ও কারিকুলাম তৈরী করে আমি জেল থেকে বের হই। বিস্তারিত বিশ্লেষণের পূর্ব সেই রূপ রেখা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

১। বর্তমান মানবসমাজ গুলো ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই সর্বপ্রথম ইসলামের মর্মকথা মানুষের অন্তরের গহীনে প্রবিষ্ট করাই ইসলামী আন্দোলনের মূল শ্লোগান হওয়া উচিত।

২। যারা এতে সাড়া দিবে তাদেরকে ইসলামী নীতি-নৈতিকতা, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ও অন্যান্যদের সাথে ইসলামের ব্যবহার নীতির শিক্ষা দিতে হবে এবং আন্দোলনের পথে পথে শত্রুদের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সজাগ করতে হবে।

৩। ইসলামী আচার-আচরন, ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী আক্বীদা সম্পর্কে সম্যক অবগত বিপুল কর্মী ব্যতীত সংগঠনের কোন কাজ শুরু না করা।

৪। প্রথমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার রব না তুলে শাসক-শাসিতসহ

গোটা সমাজকে ইসলামের সঠিক তাৎপর্যের দিকে ফিরিয়ে আনার আওয়াজ তুলতে হবে এবং এমন এক পদ্ধতির অনুকরণ করতে হবে যে পদ্ধতিতে সমস্ত মানুষকে পরিব্যপ্ত না করা গেলেও এমন কতক মানুষকে

পরিব্যপ্ত করতে হবে যাদের প্রভাবে সমাজ প্রভাবিত হয় এবং যাদের কথায় মানুষ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রতি লালায়িত হয়।

৫ । ক্ষমতাসীন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা বিপ্লব ঘটিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্টা করা সম্ভব নয়; বরং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনায় এমন পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে সমাজ নিজ প্রয়োজনে ইসলামী জীবন-বিধানকে রাষ্ট্রীয় বিধান করতে বাধ্য হয়।

৬। এই রকম ইসলামী আন্দোলন যে আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট হল জুলুমের আশ্রয় না নেয়া এবং নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি ব্যবহার না করা। তবে আন্দোলন ও আন্দোলনের কর্মীদের উপর থেকে জালেমের জুলম প্রতিহত করার জন্য সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তাতে কোন সন্দেহে নেই।

আমার মতে সমকালীন যে কোন ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা এই রকমই হওয়া উচিত। আমি জেল থেকে বের হবার পর নিম্মোক্ত যুবকরা ধারাবাহিক ভাবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আব্দুল ফাত্তাহ, ইসমাঈল, আলী উসমাবী, আহমদ আব্দুল মজীদ, মজীদ ও ছবরী। উল্লেখ্য, তাদের কেউ কেউ ইখওয়ানের কর্মী আর কেউ কর্মী না হলেও ইসলামী মনোভাব পোষণ করেন। তারা আমাকে জানাল যে, একটি সংগঠন নিয়ে তারা চার বা পাঁচ বছর থেকে কাজ করে আসছে। তাদের মধ্যে তিন ধরনের লোক রয়েছে- (১) ঐ সব ইখওয়ান কর্মী যারা বন্দী হয়েছিল। (২) যারা কারাবরণ করেনি। (৩) যারা সদ্য ইখওয়ানে যোগদান করেছে। তারা ইখওয়ানের কর্মকান্ড-পারস্পরিক আলোচনা, প্রবাহমান ঘটনাবলীর প্রতি নিরবতা, সুসময়ের অপেক্ষা ও দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখে ইখওয়ানকে নব জীবন দানের জন্য এই সংগঠনটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমে তারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করেন। পরে সবার চিন্তা একই যোগসূত্রে মিলিত হবার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সংগঠনের কার্ধক্রম শুরু করেন।

তারা সবাই ছিল অনভিজ্ঞ যুবক। তারা ইখওয়ানের কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নেতা বানাতে চায়। এই জন্য তারা উস্তাদ ফরীদ, আব্দুল খালেক এবং ওয়াহাতের ইখওয়ান সহ অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু কোন নেতা পায়নি। আমি জেল থেকে বের হবার পর আমাকে এই দায়িত্ব নিতে বলেন। কারণ, আমার বইসমূহ পড়ে এবং আমার কথা শুনে তাদের চিন্তায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ইতিপূর্বে তারা মনে করত, ইখওয়ানের অচল চাকাকে সচল করতে একটি আত্মোৎস্গী দলকে সংঘবদ্ধ করা তাদের মূল কাজ। যাতে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যায়। এখন তারা বুঝল যে, তাদের কর্মক্ষেত্র আরো বিস্তৃত ও বিশাল। রাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তনের পূর্বে সমাজ পরিবর্তন করতে

হবে। সংগঠনের পূর্বে সদস্যদেরকে সঠিক পথে আনতে হবে ইত্যাদি। কিন্ত অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাদের জন্য যোগ্য নেতা নির্বাচন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত. তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা। কারণ তাদের পদ্ধতি আমার পরিপূর্ণ মনপূত হয়নি। তারা সদস্যদেরকে উপযুক্ত করে তৈরি করার পূর্বে সংগঠিত হয়েছে এবং ব্যবহারিক অনুশীলনের উপর আত্মোৎসর্গী প্রশিক্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছে। দ্বিতীয়ত. তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে শুধরিয়ে এবং সমাজ বিপ্লবের জন্য তারা যে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঠিক পথে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে তার পরিবর্তে পুরো সমাজের খোলনচলে পরিবর্তন করার চিন্তা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রস্তাব কবুল করা। আমি এই দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করলাম। আমি তাদেরকে বললাম, বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তা- চেতনা ও ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে সজাগ এবং ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে নিয়ে বিরাজমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। তোমরা আমাকে তোমাদের দায়িত্ব নিতে বলছ, অথচ তোমরা জান আমি দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। তাই তোমাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং তোমাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমার মূল দায়িত্ব হবে তোমাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্য করার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো। আর তোমাদের ধর্ম, নৈতিকতা, তাকওয়া, একনিষ্টতা ও আল্লাহর সাথে তোমাদের ব্যবহার ভালই বলে মনে হয়।

এই উদ্দেশ্যে তারা আমার সাথে এক বা দুই সাপ্তাহে একবার এবং আমার ব্যস্ততার সময় এক মাসে বা তিন মাসে একবার একত্রিত হত। আমি তাদের সাথে ও ক্রুসেডারদের অবস্থানের ইতিহাস নিয়ে অধ্যায়ন ও আলোচনা করতাম এবং ফ্রান্সের আক্রমনের পর মুসলিম অঞ্চলের অবস্থাকে মূল্যায়ন করতাম। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ও সংবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করতাম। আমি তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম- তারা যেন এমন কিছু মানুষ নির্বাচন করে যারা আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমের এবং ফ্রান্স ও ইংরেজী ভাষায় ইসলাম ও মুসলিম ভূখন্ড সম্পর্কে লিখিত বই সমূহের খবরাখবর রাখবে।

আহমদ আব্দুল মজীদ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা করে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে চারবার আমার সাথে একত্রিত হয়েছিল। এরদ্বারা তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছিলাম কিন্তু তাদের সাথে আমার যোগাযোগের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বৈঠকের সংখ্যাও ছিল সীমিত। আমার ব্যস্ততা, অসুস্থতা ও কায়রোর বাইরে অবস্থানের সময়কে বাদ দিলে যে সময় দাড়ায় তা মাত্র ছয় মাস এবং বৈঠকের সংখ্যা হয় দশ কি বার। তাতেও মূল বিষয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। অন্য সময়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা, অস্ত্রের যোগান, অবশিষ্ট ইখওয়ানদের ব্যাপারে অবস্থান নির্ধারণ ও সংগঠনের বিরুদ্ধে

জুলুম প্রতিহত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হত। আমি মনে করি দায়িত্বশীলদের কাছে অন্য বিষয়ের চেয়ে এই-বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই বিষয়টি স্পষ্ট হবার জন্য আমি তার পরিপূর্ণ রূপ রেখা তুলে ধরছি। আমরা ইতিপূর্বে একমত হয়েছিলাম যে, শাসনরীতি পরিবর্তন ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য

শক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু এই সংগঠনের উপর জুলুম অত্যাচার আসলে তার জবাবে শক্তিকে ব্যবহার করা হবে। এর প্রেক্ষিতে একটি দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের জন্য অস্ত্র ও রসদের যোগান দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। তারা আমার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণ পর্বটা শুরু করেছিল। কিন্তু তারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের বিশ্বাস ও চেতনা কতটুকু মজবুত হয়েছে তা লক্ষ্য করত না। আমি তা বিবেচনা করার অনুরোধ জানালাম৷ এই উপলক্ষে তাদের থেকে জানতে চাইলাম, প্রশিক্ষণরতদের সংখ্যা কত। তারা সত্তরজনের মত বলে আমাকে জানাল। যুবকদের অন্তরে বিরক্তি আসবে ভয়ে এবং কিছু ইখওয়ান বন্দী হওয়ার পর প্রশিক্ষণকে দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অস্ত্র যোগানের বিষয়টির দু’টি দিকে রয়েছে-

প্রথমতঃ তারা আমাকে অবহিত করল যে, প্রশিক্ষণের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতির অর্জন করা কষ্টকর হওয়ায় তারা দেশীয় প্রযুক্তিতে কিছু বোমা তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল এতে তারা সফল হয়েছে। কিছু বোমাও তৈরী করে ফেলেছে। কিন্তু তারা আরো উন্নত প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী।

দ্বিতীয়তঃ আলী উসমাবী অনির্ধারিত সাক্ষাৎতে আমাকে জানাল যে, আমরা মিলিত হওয়ার দু’বছর পূর্বে সে আরবদেশের কোন একজন থেকে কিছু অন্ত্র চেয়েছিল। অস্ত্রের একটি ফর্দও তৈরী হয়েছিল। এরপর বিষয়টি ঝিমিয়ে পড়ে। এখন সেই ব্যক্তি সংবাদ দিল দু’মাসের মধ্যে সুদানের সীমান্ত দিয়ে সে অস্ত্রগুলো পাঠাবে। তখন ছিল সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত পরিবেশ। এই সংবাদটি অপ্রত্যাশিত ছিল বলে এই বিষয়ে পরামর্শ ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। পরামর্শের জন্য একটি সময় ঠিক করলাম। পরের দিন নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল এসে বলল, সে আলীর সাথে আলোচনা করে বুঝল এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তাই ছবরী উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা উচিত। আমি বললাম, এই বিষয়ে পরমর্শের জন্য আমরা অচিরেই একত্রিত হব। প্রথম বৈঠকে ছবরী ছিলনা বিধায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। দ্বিতীয় বৈঠকে ছবরী উপস্থিত ছিল। এতে ভাই আলীকে দায়িত্ব দেয়া হল যে, অস্ত্রের উৎস, অন্ত্র ক্রয়ের অর্থের উৎস, অস্ত্র হস্তান্তরের ধরন অর্থাৎ একবারে হবে, নাকি দফায় দফায় হবে এবং কোন পথে আনা হবে এসব না জানা পর্যন্ত সবকিছু স্থগিত রাখা এবং প্রেরককে বলতে হবে পরবর্তী সংবাদ না দেয়া পর্যন্ত অস্ত্র প্রেরণ করবেন না। একমাস পর আলী আমাকে সংবাদ দিল, অস্ত্রগুলো ইখওয়ানের টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে আর চালানটি সুদানের পরিবর্তে লিবিয়ার পথ দিয়ে

প্রেরণ করে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, লিবিয়ায় এমন কিছু ইখওয়ানের সাথে আমার সখ্যতা রয়েছে যারা এই ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে দু’জনের নাম স্মরণ আসছে। যাদের সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছে জেল থেকে বের হবার পর। একজন হল- তীব আশ-শীন সে একজন শিক্ষার্থী।

তার সাথে লিবিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী অবস্থিত মরুভূমি দিয়ে মাল পারাপারকারীদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। অপরজন হল মবরুক, সে একবার আমাকে বলেছিল, তার কিছু আত্মীয় আছে যারা লিবিয়া ও মিসর আসা-যাওয়া করে এমন কাফেলার সাথে কাজ করে। আরো বলল, লিবিয়া বা অন্য স্থান থেকে কোন জিনিস মিসরে আনার প্রয়োজন হলে সে নিরাপদে এনে দিতে পারবে। কারণ কাফেলায় তার মানুষ রয়েছে। কিন্তু কাফেলাগুলো কোন ধরনের কাফেলা এবং সে কোন ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিসরে এসেছে, সে সম্পর্কে আমি তাকে কোন জিজ্ঞাসা করেনি। একবার বলল, সে মিসরে তৈরী হওয়া এক ধরনের কোট ইস্কান্ধারিয়া থেকে আমদানি করে মরক্কোয় বিক্রি করে। আরেকবার বলল, কিতাবের একটি চালান নিয়ে এখানে এসেছে। যাহোক আমি তার পেশা সম্পর্কে নিশ্চিত নই। মাল যোগানের বিষয়টি নিয়ে আমাদের সম্মিলিত ও একক বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আমি জানলাম, শাইখ আব্দুল ফাত্তাহের কাছে মোটা অংকের কিছু টাকা রয়েছে। সে বলত নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য এই মালগুলো তার কাছে আমানত হিসেবে রয়েছে। তাই সাহায্য-সহযোগিতা সহ অন্যান্য খাতে সেখান থেকে ব্যয় করা সন্ভব নয়। সে আমাকেও একান্ত আলাপে তাই বলেছিল। কিন্তু বোমা তৈরী ও অস্ত্রক্রয়ের সম্পর্কে সে বলল, এসব ক্ষেত্রে এখান থেকে ব্যয় করা যাবে। সে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিল। আমি অনুমতি দিলাম। কিন্তু এর উৎস ও পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জানতাম না। তবে সত্য যে, এই মালগুলো ছিল বহিবির্শ্বের ইখওয়ানদের পক্ষ থেকে অন্য কোন উৎস থেকে নয়। কারণ আমার উপদেশ হচ্ছে, কর্মী ব্যতিত অন্য কারো কোন প্রকার সাহায্য নেয়া ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনুচিত। সম্পদের পরিমান পুরাপুরি না জানলেও শুনেছি তাতে একহাজার মিসরীর মুদ্রা রয়েছে। আমি তাদের খুটিনাটি বিষয় সম্পর্ক জ্ঞাত ছিলাম না; বরং মৌলিক পরিকল্পনাগুলো আমার সামনে আমার সম্মতিতে চূড়ান্ত হত। অনুরূপ ইরাকের ইখওয়ানদের থেকে দু’হাজার মিসরীয় মুদ্রা এসেছে। ভাই আলী তা গ্রহণ করেছে। এটা এ জন্যই যাতে টাকাগুলো তার কাছে থাকে এবং তার অধীনে খরচ হয়। ইরাকী ইখওয়ানদের সাথে সম্পর্কের বিবরণ সামনে আসছে।

ইসলামী আন্দোলনের বাঁধাঃ প্রতিরোধ পরিকল্পনা

দেশের প্রচলিত শাসনরীতিকে পরিবর্তন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি ব্যবহার না করার এবং আন্দোলনে বাঁধার জবাব শক্তির মাধ্যমে দেবার ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছিলাম।

আমাদের সামনে মূলনীতি হিসেবে ছিল এই আয়াত “যারা তোমাদের উপর জুলুম করেছে তাদের উপরও তোমরা জুলুম কর। যেমন জুলুম তারা করেছে।” ১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালে জেল-জুলুম, হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন, দেশান্তর বিতাড়ন সহ নানা অত্যাচার আমাদের উপর হয়েছিল। কিন্তু এসব অতীত হয়েছিল বিধায় তার পিছনে না পড়ে; বরং নতুনভাবে জুলুম হলে তার জবাব দেবার সিদ্ধান্ত নেই। যদিও ইসলাম কাউকে কষ্ট দিয়ে ও তার মানবিক মর্যাদা বিনষ্ট করে তাকে ভিক্ষার পথে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দেয় না। তাইতো দেখা যায় ইসলামে যেসব ব্যক্তির উপর হদ্দ বা শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা হয় তাদের পরিবারকে ইসলামী রাষ্ট্র লালন-পালন করে। কিন্তু দু’টি কারণে জুলুমের জবাব দেবার জন্য আমাদের সামনে হত্যা ও যুদ্ধ ব্যতিত অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। প্রথমতঃ যাতে জালেমরা ইসলামী আন্দোলনকে অত্যাচারের সহজ ক্ষেত্র বানাতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ যে জাতির সর্বত্র স্বেচ্ছাচারিতা, বক্রতা ও দুর্বলতা বিরাজমান সে জাতির মধ্য থেকে কিছু নৈতিকতার বলে বলিয়ান যুবককে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।

এসব কারণে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। আমি তাদেরকে তাদের শক্তি সামর্থ্য যাচাই-বাছাই করে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আরো চিন্তা করতে বলেছি। আরো বলেছি আমাদের পাল্টা জবাব এমন প্রচন্ড হতে হবে যাতে শত্রুরা হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

পরবর্তী বৈঠকে আহমদ আব্দুল মজীদ এমন কিছু অপারেশনের প্রস্তাব তুলে ধরল যা দ্বারা সরকার ইখওয়ানের পিছু না নিতে বাধ্য হয়। মাঝে মধ্যে সরকার নিজেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে কোন ঘটনা ঘটিয়ে ইখওয়ানের উপর চাপিয়ে দেয় এবং ইখওয়ানের পিছু নেয়। যেমন আলেকজান্দ্রিয়া ও তাররার ঘটনা। আর কখনো কখনো বার্হিশক্তির বা দেশীয় অশুভ শক্তির অপতৎপরতার কারণে ইখওয়ানের পিছু নেয়। অপারেশনের মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপদেষ্টা প্রধান ও পুলিশ প্রধানকে অপসারণ করা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা উড়িয়ে দেয়া। যেমন বিদুৎ কেন্দ্র ও নৈশক্লাব ইত্যাদি। কিন্তু পরে স্থাপনা ও নৈশ ক্লাব উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তটি স্থগিত হয়।

আমি তাকে বললাম, এসব অপারেশন সফল হলে ইখওয়ান কর্মীদেরকে আর জেল-জুলুম সহ অন্যান্য নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু তোমাদের

শক্তি-সামর্থের অবস্থা কি? তার কথা থেকে বুঝলাম, তাদের কাছে এ কাজের জন্য যথেষ্ট শক্তি নেই। উপরন্তু প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সর্বদা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধুনিক অন্ত্র সজ্জিত সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। সুতরাং আমি ইতিপূর্বে যে সামরিক প্রশিক্ষণকে আন্দোলনের জন্য শেষ অবলম্বন বলে মনে করতাম না

এবং যার কার্যক্রম বিলম্বিত করার পক্ষপাতী ছিলাম সে সামরিক প্রশিক্ষণ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্বরোপ করলাম। কারণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে ইখওয়ানের উপর বিপদ অত্যাসন্ন। আর বিপদ বলতে হত্যা, শাস্তি, বিতাড়ন ও দেশান্তর ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি শুনলাম কমিউনিষ্টরা গুজব রটাচ্ছে যে, ইখওয়ানরা পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে। নতুন নেতৃত্বের শরণাপন্ন হচ্ছে। আরো শুনলাম সংবাদিকদেরকে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য সংবাদিক সমিতিতে নানা লিপলেট ছেড়েছে। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। কারণ, ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি কোন এক ঘটনার নিহত দু’জন খ্রীষ্টান পাদ্রীর ব্যাগ থেকে ইখওয়ানের মোহরাংকিত এমন কিছু লিপলেট জব্দ করা হয় যেগুলোতে ইখওয়ানের সাংবাদিক হত্যার কথা উল্লেখ রয়েছে।

উস্তাদ মুনির আল-দাল্লা আমাকে ঐসব অবিবেচক যুবক যারা কোন নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে বলল, আমি হাজ্জা যয়নব গাজ্জালীর মাধ্যমে মার্কিন গোয়েন্দা অফিসের এই তথ্য জানলাম যে, ঐসকল যুবক ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর গোয়েন্দারাও ইখওয়ানকে পর্যদুস্ত করার জন্য তাদেরকে কাজে লাগাতে চায়। ইতিপূর্বে আলহাজ্ব আব্দুর রজ্জাক হুয়াঈদী ও উস্তাদ ছালাহ শাদী, উস্তাদ ফরীদ আব্দুল খালেকের শ্বশুর উস্তাদ মুরাদ জায়্যাত থেকে শুনে আমাকে অবহিত করেছিল যে, ঐ সমস্ত যুবকের সাথে সাবেক মন্ত্রী আব্দুল আজীজ আলীর মধুর সম্পর্ক আছে। আর এই মন্ত্রী ছিলেন মার্কিন পন্থী। উল্লেখ্য, উস্তাদ ফরীদ ও মুনীরের মাঝে গভীর সম্পর্ক ছিল। যুবকরা আমাকে বলেছিল তারা নেতা সন্ধানের সময় উস্তাদ আব্দুল আজীজ আলী ও উস্তাদ ফরীদের সাথে হাজা জয়নব গাজ্জালীর ঘরে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু তারা আব্দুল আজীজ আলীর উপর আশ্বস্ত হয়নি বলে তাকে সব কিছু খুলে বলেনি। উস্তাদ ফরীদ আমাকে বলেছিল যুবকদের সাথে কিছু সন্দেহযুক্ত মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। তখন আমি বুঝলাম এরদ্বারা তিনি আব্দুল আজীজ ও হাজ্জা যয়নবকে বুঝাতে চাচ্ছেন। আর তিনি ও উস্তাদ মুনীরের ভাষ্য হল উল্লেখিত দু’জন ইখওয়ানের বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রের হোতা। আমি জানতাম আব্দুল আজীজের সাথে যুবকদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর হাজ্জা যয়নব শেষের দিকে ইখওয়ানের বায়তুল মালে বিশাল অংকের টাকা দান করেছিলেন। তিনি মুরশিদের ঘরে যাতায়ত করতেন এবং শুধুমাত্র শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ তার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাই আমি নিশ্চিত ছিলাম গোয়েন্দারা এই দিক দিয়ে খুব একটা লাভবান হবেনা।

যা হোক বিরাজমান পরিস্থিতি ইখওয়ানের উপর বিশেষতঃ এই নতুন সংগঠনের উপর আসন্ন বিপদের ইংগিত বহন করছে। তাই আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিই। এটাই ছিল সম্মিলিতভাবে সবার সাথে আমার শেষ বৈঠক। এরপর শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ ও ভাই আলী উসমাবী রা’সূল বিরে পৃথকভাবে আমার সাথে

মিলিত হয়েছিল। কিন্তু আমি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বা তাদের অন্য কোন নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করিনি। এরপর পুনরায় ইখওয়ান কর্মীদের ধর-পাকড় শুরু হয়। কিন্তু তাতে এই সংগঠনের কোন সদস্য ছিল না। তবে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ে। সে সময় আমি হাজ্জা যয়নবের মাধ্যমে তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছালাম যে, তারা যেন সুদান দিয়ে অস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি এবং তাদের অন্য সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখে। তখন ভাই-আলী হাজ্জা যয়নবের মারফত আমার থেকে জানতে চাইল আমাদের সংগঠনের উপর জুলুম হলেও আমরা কি আপনার এই নির্দেশনা মতে চলব? আমি বললাম, এই নির্দেশনা শুধু এই সময়ের জন্য। তবে যদি তোমরা প্রচন্ড ও কার্যকরী জবাব দিতে পার তখন তাই শ্রেয় হবে। কিন্তু আমি জানতাম তাদের কাছে যথেষ্ট শক্তি নেই।

প্রথম যখন অত্যাচারের জবাব দেয়ার কলা-কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তখন ব্রীজ, সেতু ও নৈশক্লাব ধ্বংসের প্রসংগ স্থান পায়নি। এ গুলো পরে স্থান পায়। কারণ প্রয়োজনীয় স্থাপনা ধ্বংসের কারণে জাতির জীবন ও অর্থনীতি প্রভাবান্বিত হয়। এরপর আমি তাদেরকে এসব কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিই। কারণ এসব কর্মকান্ড দুই দিক দিয়ে যয়নবাদীদের উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্য রাখে। প্রথমঃ নীতিগত ও আদর্শগত দেওয়ালিয়াপনা সৃষ্টি করে মানব বৈষ্যম্যের সূচনা করা। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ও সামরিক ভাবে পঙ্গু করা। ভাই আলী উসমাবী এই প্রসংগে আমাকে বলল, আমরা যদি ব্রীজ, সেতু ও নৈশক্লাব ধ্বংস করি তখন আমরা যয়নবাদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী হব। অথচ তাদের সাথে কি আমাদের কোন সম্পর্ক আছে? আমি এই বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করার পর তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, সরকারকে ইখওয়ানের পিছু না নিতে বাধ্য করার জন্য যতটুকু ধ্বংসাত্মক কাজ করা দরকার শুধু ততটুকুই করা হবে। কিন্ত এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই থেকে গেল। বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ আমি বন্দী হওয়ার আগ পর্যন্ত জানতাম তাদের কাছে যথেষ্ট শক্তি ছিল না। আর তাদের প্রতি আমার উপদেশ ছিল যে, শক্তিঅর্জন ব্যতিত কোনক্রমেই এই পথে অগ্রসর হওয়া যাবেনা। আমি বন্দী হবার আগ পর্যন্ত এইরকমই ছিল অবস্থা। এরপর কি হয়েছে তা আমি জানিনা। তবে এটা স্পষ্ট যে, তারা কিছুই করতে পারেনি। কারণ এরপর তাদের হাতে মাত্র তিন সপ্তাহ সময় ছিল।

বহির্বিশ্বের ইখওয়ানদের সাথে আমাদের সম্পর্কঃ

বিগত বছরের কোন একদিনে আলী উসমাবী আমাকে বলল, ইরাকী ইখওয়ানদের এক প্রতিনিধি যিনি মিসরে লেখাপড়া শেষ করে এখন ইরাকে চলে যাচ্ছে সে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি সাক্ষাতের সময় দিলাম এবং সে নির্দিষ্ট সময় সাক্ষাৎ করে। তার নাম হাজেম বা আছেম ছিল।

উক্ত বৈঠকে আমরা বিভিন্ন দেশে ইখওয়ানদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। সে আমাকে জানাল বহির্বিশ্বের ইখওয়ানরা মিসরের কমান্ড চায়। কিন্তু মিসরের ইখওয়ান নেতারা তাদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রাখেনা। তাই সবাই বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ইরাকের ইখওয়ানরাও পৃথক নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুচ্ছে। তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন দেশের ইখওয়ানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায়। কিন্তু অন্যরা সেদিকে ভ্রক্ষেপও করে না। তাদের একজন প্রতিনিধি বৈরুতে একটি অফিস খুলে জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া ও সৌদিয়াতে অবস্থানরত মিসরী ইখওয়ানদের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করছে। তবুও ইরাকীদের পরিকল্পনা আলাদা। কারণ অন্যদের সাথে তাদের চিন্তধারা একই যোগসূত্রে মিলিত হওয়া অনেক সময়ের ব্যাপার।

তাকে আমি আমাদের উদ্ভাবিত ইসলামী আন্দোলনের কারিকুলাম সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিলাম । আমি বললাম, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বে মজবুত ইসলামী আক্বীদা বিস্তার করতে হবে। দল গঠনের পূর্বে ব্যক্তিগঠনের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা বিপ্লব ঘটিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে এবং বিরাজমান দেশীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকতে হবে।

সে আমাকে বলল, ইখওয়ানের নেতা হিসেবে উস্তাদ ফরীদ আব্দুল খালেকের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। তার ব্যাখ্যা মতে ইখওয়ানের চিন্তাধার সাথে আপনার চিন্তাধারার বিরাট পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি। সে প্রশ্ন করল, কেন এই তফাৎ? উত্তরে আমি বললাম, আমার চিন্তাধারার সাথে আন্দোলনের চিন্তাধারাকে একাকার করা বর্তমান পরিস্থিতিতে মোটেই সম্ভব নয়। তাকে নতুন সংগঠন সম্পর্কে কিছুই বলেনি। কিন্তু সে অসন্তষ্টি প্রকাশ করেছে। চলে যাবার সময় সে বলল, আমি উস্তাদ ফরীদের সাথে যোগাযোগ রাখব এবং আপনার চিন্তাধারাও ইরাকীদের কাছে পৌঁছাব। কয়েক মাস পর সে ইরাক থেকে ফিরে এসে অন্য একজন ইরাকীকে সাথে নিয়ে আলীর মাধ্যমে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। সে এবং তার বন্ধু আমাকে জানাল মিসরের বর্তমান অবস্থা ইরাকীদের কাছে বর্ণনা করার পর তারা আমাকে

আপনার সাথে যোগাযেগ করার তাগিদ দিল। কারণ আপনার ও তাদের চিস্তাধারা প্রায় অভিন্ন। সে দু’শত মিসরী মুদ্রা হাদিয়া দিল। আমি টাকাগুলো ভাই আলীকে দিয়ে দিলাম। এছাড়া আর কোন যোগাযোগ হয়নি।

* * *

গত মার্চে জর্ডানের এক ইখওয়ান কর্মী আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। তার নাম ছিল ডাক্তার আব্দুর রহমান। তার পুরো নাম উস্তাদ ফরীদ জানেন।

সে আমাকে বলল, সে জর্ডানী ইখওয়ানদের প্রতিনিধি হিসেবে মিসরের ইখওয়ানদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে এবং আমার কারামুক্তির প্রেক্ষিতে জর্ডানী ইখওয়ান এবং তাদের নেতা আব্দুর রহমান খলীফার পক্ষ থেকে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। অতঃপর মুনাজ্জামাতুত তাহরীর ও শুকায়রীর সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। সে জানাল ফিলিস্তিন সংস্থা গঠনের শুরুতে শুকায়রীর সাথে তাদের সম্পর্ক হয়। উক্ত আলোচনা থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তাহলো- শুকায়রী সংস্থা গঠনের পূর্বে তাদের থেকে সাহায্য চেয়েছিল। তারা শুকায়রীকে ফিলিস্তিন সমস্যার প্রতি আন্তরিক মনে করে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর দেখা যায়, সে ইখওয়ানদের দূরে রেখে কমিউনিষ্টদের প্রাধান্য দেয়। ইখওয়ানরা অভিযোগ করলে সে বিষয়টি পুণবিবেচনা করার আশ্বাস দেয়। এরপর বিষয়টি থমকে যায়। সে অভিযোগ করল, মিসরের নেতারা তাদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনা, কোন দিকনির্দেশনাও দেয়না অথচ তারা নিজেদেরকে কায়রোর সাথে সম্পৃক্ত মনে করে। সে আরো জানাল, এক সময় মিসরী রাষ্ট্রদূত তাদের নেতা আব্দুর রহমান খলীফা কে প্রশ্ন করল, কায়রো থেকে কোন ডাক আসলে আপনারা কি সাড়া দিবেন? উত্তরে তাদের নেতা বলল, আপনি যেমন আপনার নেতার হুকুম মেনে চলেন অনুরূপ আমরাও মুরশেদের হুকুম মেনে চলব। তখন রাষ্ট্রদূত বলল, আপনাদের অবস্থা যেন মিসরের ইখওয়ানদের মত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। উত্তরে আব্দুর রহমান বলল, আমরা নিজেদেরকে মিসরী ইখওয়ানদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করি। এরপর সে আমার থেকে কিছু দিকনির্দেশনা চাইল। আমি বললাম, কোন অভ্যন্তরীন বিষয়ে আমি দিকনির্দেশনা দিব না। কারণ আমি মুর্শিদ নই এবং তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নই। তোমরা তোমাদের সাংগঠনিক অবস্থা, পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। এরপর সে মুর্শিদের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইল। আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম। কারণ আমি জানতাম মুর্শিদের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং তিনি এসব সাক্ষাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সে আমাকে বলল, আমি উস্তাদ ফরীদের সাথে দেখা করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? আমি বললাম, কোন

অসুবিধা নেই। সে আমার থেকে ফিলিস্তিন সংস্থা সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ চাওয়ার পূর্বে সামগ্রিক কিছু পরামর্শ চাইল। তখন আমি আমার উদ্ভাবিত ইসলামী আন্দোলনের কারিকুলামকে পরমার্শ হিসেবে নয়; বরং আমার মতামত হিসেবে তার সামনে পেশ করলাম। কারণ ১৯৫৩ সালে জর্ডানে অবস্থানকালে আমি দেখেছি, জর্ডানী ইখওয়ানরা দেশীয় রাজনীতিতে আকণ্ঠ ডোবা। তাই ভাবলাম, তাদেরকে সেখান থেকে দূরে সরে আসার পরামর্শ দেওয়া অরণ্যরোদন ব্যতিত কিছুই হবে না।

উস্তাদ ফরীদ আমাকে কারামুক্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাতে আসলে তার থেকে জেনেছি সেই জর্ডানী তার সাথে ও মুর্শিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। কিন্তু কোন পরামর্শ নেয়নি। মুর্শিদও আমাকে তার ব্যাপারে অনুরূপ বলেছিল। সে জর্ডানী আমাকে আরো বলেছিল সিরিয়ার আরব জাতিয়তাবাদী গোষ্ঠী উস্তাদ ইছাম ইতাবের সাথে সাক্ষাৎ করে বার্থ পার্টির সাথে তাদের বিরোধে ইখওয়ানের সাহায্য চেয়েছিল। কারণ বার্থ পার্টি ও সরকার যেমন জাতিয়তাবাদীদের বিরোধী তেমনি ইখওয়ানেরও বিরোধী। উস্তাদ ইছাম বলেছিল, মিসরের কারাগারে ইখওয়ানের কর্মীরা বন্দী থাকাবস্তায় এই রকম সহযোগিতা সিরিয়া ও অন্যান্য আরবদেশের ইখওয়ানরা কখনো মেনে নিবে না। কারণ জাতিয়তাবাদী ও কায়রো সরকারের মধ্যে গভীর সখ্যতা রয়েছে। তাই মিসরে ইখওয়ানদের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া এই রকম সহযোগিতার পূর্ব শর্ত।

* * *

ভাই আলী উশমাবী আমাকে বলেছিল, সুদানী ইখওয়ানদের এক প্রতিনিধি মিসরে রয়েছে। সে আমার সাথে দেখা করতে চায়, কিন্তু তার সাথে আমার দেখা হয়নি। সে আলীর সাথে দু’য়েকবার সাক্ষাৎ করে সুদানে সামরিক শাসন অবসানে ইখওয়ানের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছিল। সে তাকে আরো অবহিত করেছিল যে, সামনের সাধারণ নির্বাচনে ইখওয়ান সংখ্যাগরিষ্ট লাভ করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

তখন আমি আলীকে বলেছি এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ধীরগতি ও সদূরপ্রসরী কর্মপন্থা হাতে নেয়া ব্যতিত এই মহৎ লক্ষ্য অর্জিত হবেনা। প্রথমে নতুনভাবে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী আক্বীদা ও ইসলামী চরিত্রের প্রচার-প্রসার করতে হবে৷ এটাই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অধিক সহজতম পন্থা। আমি আলীকে আরো বলেছিলাম যে, সুদানী ইখওয়ানরা মিসরী ইখওয়ানদের মত অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। তাদেরকে সেই কাংক্ষিত লক্ষ্য পৌঁছতে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তবে আমি মনে করি তারা আমাদের থেকে কোন দিকনির্দেশনা নিবেন।

পরবর্তীতে নির্বাচনে ইখওয়ানদের ভরাডুবিরপর সে প্রতিনিধি আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের হতাশার কথা উল্লেখ করেছিল। আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানি না। কারণ তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

* * *

এই বৎসর আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে আমি বন্দী হবার এক সপ্তাহ পূর্বে লিবিয়ার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি ইখওয়ানের দল আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তাদের একজনের নাম ছিল ফাতেহ। অপর দু’জনের নাম আমার জানা নেই। ইতিপূর্বে ভাই ত্বীব শীন মিসর থেকে সফর করার পূর্বে আমাকে বলেছিল যে ভাই ফাতেহ আমার সাথে

সাক্ষাৎ করতে চায়। তারা ভাই মররুককে সাথে নিয়ে আতলাস হোটেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তারা আমার থেকে ১৯৫৪ সালে ঘটিত আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটানার, বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চাইল। তারা বলল, আমরা মনে করি এটা ইখওয়ানের কাজ নয়। কারণ সে ঘটনার বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এত দূর থেকে সাধারণ পিস্তল দিয়ে এই রকম দুঃসাহসিক কাজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তখন আমি সালাহ দসুকী থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে যা শুনেছি তা তাদেরকে বলেছি। তাদের সাথে সাক্ষাতের দুই কি তিন দিন পূর্বে আমার ভাই মুহাম্মদ কুতুব বন্দী হয়েছিল।

তারা আমাকে প্রশ্ন করল, সে কেন বন্দী হয়েছে এবং সে এখন কোথায়? আমি বললাম এই সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি সে কখনো কোন দল ৰা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল না। সে সময় আমি তাদেরকে বলেছিলাম, অতিসত্ত্বর আমি সহ অন্যান্য ইখওয়ানদেরকেও কারাবরণ করতে হবে।

আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনার সম্পর্কে সায়্যিদ দসুকীর অভিমত তাদের সামনে বর্ণনা করার সময় আমি বললাম সরকারকে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্য এই রকম ঘটনা ভবিষ্যতে আরো ঘটতে পারে। বিশেষত কমিউনিষ্টরা কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তার জন্য ইখওয়ানদের দোষারোপ করতে পারে।

ভাই ফাতেহের লেবনান ও জর্ডান সফর করার শিডিউল রয়েছে। সে আমাকে বলল, আমি উস্তাদ ইছাম ইতার ও উস্তাদ আব্দুর রহমান খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে এখানকার জেল-জুলুমের খবর ও আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনার বর্ণনা দিব। আমি তাতে নিষেধ করেনি। কিন্তু বললাম, আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনার রহস্য সম্পর্কে আরো গবেষণা ও অনুসন্ধান করতে হবে। তাই এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানা ব্যতিত কিছু বলা উচিত হবে না। তবে এই রকম ঘটনা সামনে হলে তখন বলতে পার।

আমি শুনেছি আমার কিছু বই বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেগুলো আর প্রকাশ করা হবেনা। তাই আমি ফাতেহকে বললাম, যদি বাইরের কোন প্রকাশনা এ সমস্ত বই প্রকাশ করতে চায় আমি তাদেরকে অনুমতি দিব। তখন তারা বলল, আমরা লিবিয়ায় একটি প্রকাশনী খোলার পরিকল্পনা নিয়েছি। বৈরুত আমদানী রফতানীর মুক্ত বাজার হিসেবে সেখানেও আমাদের একটি শাখা থাকবে। সে প্রকাশনী থেকে আপনার বইগুলো প্রকাশ করব। আমি বললাম, আমি যা শুনেছি তা যদি বাস্তব ঘটে তাহলে বইগুলো ছাপানোর জন্য তোমাদেরকে পূর্ণ অনুমতি দিলাম।

তারা লেখকের সম্মানী হিসেবে কিছু টাকা আমাকে দিতে চেয়েছিল। আমি তাদের কৃজ্ঞতা প্রকাশকরে ছাপানোর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললাম। আমি বললাম, তোমরা বইগুলো ছাপানোর পর আমার প্রাপ্য আমার পরিবারের কাছে পৌঁছিয়ে দিও। আমার ভাই মুহাম্মদ বন্দী ছিল বিধায় আমার ভাগিনা রিফআত ও আজমীর নাম তাদের কাছে

উল্লেখ করে বললাম, আমার অনুপস্থিতিতে উভয়ের কাউকে দিলে হবে। আমি জানতাম তারা বন্দী হবে না। কারণ তারা নতুন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলনা এবং ইতিপূর্বে ইখওয়ানেও জড়িত ছিলনা।

* * *

গত বছর আমি জেল থেকে মুক্তি লাভের কিছুদিন পর সিরিয়ার এক ইখওয়ান কর্মী আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। সে সাক্ষাতের আংশিক দৃশ্য আমার হৃদয়পঠে এখনও ভাসছে। কিন্তু আলী উশমাবী তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানে বলে মনে হয়। আমি তার সম্পর্কে এতটুকু জানি যে, সে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য সিরিয়া থেকে ইংল্যান্ড যাবার পথে মিসরে কিছুদিন অবস্থান করছে। সে মিসর থেকেও উচ্চ ডিগ্রী নিয়েছিল।

সে আমার কারামুক্তি উপলক্ষে সিরিয়ার ইখওয়ান প্রধান ইছাম ইতারের শুভেচ্ছা বাণী আমার কাছে পৌঁছেদিল এবং সিরিয়ার ইখওয়ানের অবস্থান ও ইখওয়ানের উপর বার্থ পার্টির নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেছে। সে আমাকে বলল, আপনি সিরিয়ার ইখওয়ানদের কোন দিকনির্দেশনা দিবেন কী? আমি বললাম, আমি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিতে পারব না। কারণ তারাই তাদের পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তবে আমি সমস্ত ইখওয়ান ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এই উপদেশ দিব যে, তারা যেন প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ তাদের

কাজ করার জন্য এর থেকে অধিক বিস্তৃত ও দীর্ঘায়তনের এক ময়দান রয়েছে। তাহল ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সমাজে ইসলামী মূল্যাবোধ ও ইসলামী আচার-আচরণের বিস্তার ঘটানো। আর এই পথেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। ইন-শা-আল্লাহ।

আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, সিরিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলেমীন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই সংগঠন পুরোদমে প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সে আমাকে বলল, আমরা বদি প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করি তাহলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। তখন বার্থ পার্টি সহজে আমাদেরকে বধ করতে সক্ষম হব। আমি বললাম, অতীত ঘটণাবলী অনুসন্ধান করে আমি এই কথা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র দেশীয় শক্তি ইখওয়ান বা অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের উপর ঝাপিয়ে পড়েনা; বরং যায়নবাদী, ক্রুসেডার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় শক্তিকে এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে থাকে। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের শত্রুর সংখ্যা ভেতরের থেকে বাহিরে অধিক ও অনেক।

আমি এরপর তার কাছ থেকে শুনেছি যে, উস্তাদ ইছাম সিরিয়া ছেড়ে লেবানন চলে গেছে। আরো শুনেছি যে, সিরিয়ার ও জর্ডানের ইখওয়ানরা উস্তাদ সাঈদ রমজানের আচারণে অসন্তুষ্ট। কারণ তিনি

পরামর্শবিহীন এককভাবে কাজ করেন। তিনি এমন কিছু হোটেলে অবস্থান করেন এবং এমন কিছু ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেন৷ ইখওয়ানরা যেখানে অবস্থান করা ও যাদের সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভাল দৃষ্টিতে দেখেনা। তিনি ইখওয়ানের প্রসিদ্ধ নিয়ম ‘পরিবাজক শহর বাসীর তত্ত্বাবধানে ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের অধীনে থাকবে’ মতে তাদের কোন কথা শুনেনা।

যদি কেউ তার আচরণে কোন দোষ ধরে দেয় সে বলে ইখওয়ানের পক্ষ থেকে এইরূপ কাজ করার অনুমতি আমার রয়েছে। সে আমার থেকে প্রশ্ন করল, ইখওয়ানের সংবিধান মতে উস্তাদ সাঈদকে এই অনুমতি দেয়া বৈধ হবে কি? আমি বললাম, এই সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি নেই। আর আমি সদ্য জেল থেকে বের হয়েছি এখন এই রকম বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চাই না। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, জর্ডানী ভাই ড. আব্দুর রহমানও যে- ইতিপূর্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল- উস্তাদ সাঈদ সম্পর্কে আমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিল। আমি তাকেও এই উত্তর দিয়েছিলাম।

গত বছর আমি জেল থেকে যুক্তি লাভের পর ইরাকের প্রসিদ্ধ আলেম শাইখ আমজাদ জাহবীর চাচাতো বোন সায়্যিদা খায়রিয়্যাহ জাহাবী চিকিৎসার জন্য মিসরে এসেছিল। সে উস্তাদ আমজাদের শুভেচ্ছা বাণী এবং আমি জেলে থাকাকালে আমার অসুস্থতা ও মৃত্যুর খবর শুনে তার চাচার অস্থিরতার কথা আমাকে বলল। আরো বলল যে, তার চাচা প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালামের আরেফের সাথে আমার ব্যাপারে কথা বলেছিল এবং তাকে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাছিরের সাথে আমার মুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রস্তুত পেয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ছালাম নিজেই এই উদ্যাগ নিয়েছিলেন এবং তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। সফলতার পর প্রেসিডেন্ট মিসর থেকে ফেরার সময় ইরাকের বিমান বন্দরে নামা মাত্রই শাইখ আমজাদের কাছে আমার মুক্তির সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দিলেন। এই সুসংবাদ শুনে শাইখ ও তার সাথীবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

আমি তার এই সাক্ষাতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শাইখের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজ্ঞেস করেছি। সে বলল, আমার চাচা অসুস্থতার কারণে ঘর থেকে বের হতে পারে না। সে আমাদের মাঝে দু’দিন অবস্থান করেছিল। কিছুদিন পর ইরাকে ফিরে গিয়ে আমার বোন আমিনা কুতুবের বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করেছিল। চিঠিতে তার ও তার চাচাতো বোনের শুভেচ্ছা বাণী এবং তার চাচার অসুস্থতার খবর ছিল।

***

আমি জেল থেকে মুক্তি লাভের পরপরই সংযুক্ত আবর গণতন্ত্রে নিযুক্ত ইরাকী রাষ্ট্রদূত আমার সাথে সাক্ষাৎ করে প্রেসিডেন্ট আব্দুস ছালাম আরিফের শুভেচ্ছা বাণী পৌঁছে দিলেন। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট তার মধ্যস্থতা সফল হওয়ায় আনন্দিত এবং তিনি আমার শারীরিক অবস্থা ও আমার কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা জানতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রদূত আরো বলেছেন যে, আব্দুল করীম কাসেমের শাসনামলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বন্দী থাকাবস্থায় আমার কিতাব ‘ফি জিললিল কুরআন’ তার একমাত্র সঙ্গী ছিল। আমি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম এবং ইরাকী নেতাকে আমার অভিনন্দন পৌঁছাতে বললাম। আরো বললাম যে, ইরাকী নেতার কাছে আমার একমাত্র চাওয়া হল- তিনি যেন ইখওয়ানের সমস্যা নিরসনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। রাষ্ট্রদূত আমার এই আকাংখা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছানোর অঙ্গীকার করেন।

আরবলীগের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট আব্দুস ছালাম আরিফ মিসরে পৌঁছলে আমি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি টেলিগ্রাফ

পাঠিয়েছিলাম। তিনি উত্তরও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি উত্তরটি পায়নি। এই বৎসর সেই রাষ্ট্রদূত যিনি বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী প্রেসিডেন্ট আরিফের কিছু উপঢৌকন সহ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তার সাথে আলোচনা করে বুঝলাম, প্রেসিডেন্ট আমার টেলিগ্রাফের উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সে উত্তরটি যে পায়নি তা তাকে বলিনি। কায়রোস্থ ইরাকী দূতাবাসের মাধ্যমে আমি আমার লিখিত কিছু কিতাব প্রেসিডেন্ট আরিফ ও উক্ত মন্ত্রীর জন্য পাঠিয়েছি। কারণ ইতিপূর্বে মন্ত্রী আমাকে বইগুলো বেঁধে দূতাবাসের মাধ্যমে পাঠাতে বলেছিলেন।

**********

অনুরূপ আমাকে অভিনন্দন জানাতে ইরাকী আপিল কোর্টের বিচারক সায়্যিদ জিয়া শীত খিতাব আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আব্দুস ছালাম আরিফের আমার মুক্তির জন্য মধ্যস্থতা করা এবং ইরাকী পত্র-পত্রিকায় আমার মুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সেখানকার অপরিচিত অনেক ইসলামী নেতৃবৃন্দের আনন্দিত হওয়ার খবর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে আলাপচারিতার সময় বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট, তার পিতা ও তার পরিবারের সবাই ধার্মিক। এরপর তার ভাগিনা হাজেম আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তার দ্বিতীয় মামা মেজর জেনারেল মাহমুদ শীত খিতাবের অভিনন্দন পৌঁছিয়েছেন এবং তার লিখিত ‘নেতা মুহাম্মদ সা.’ বইটি আমাকে

উপহার দিয়েছেন। আমি তার মাধ্যমে তার মামার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার বাণী ও আমার কিছু বই পাঠিয়েছি।

ছয় মাস পূর্বে সৌদী রেডিও ষ্টেশন থেকে রেজিষ্ট্রিকৃত একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিটির সাথে স্টেশনের পক্ষ থেকে বূর সাঈদ ব্যাংকে আমার একাউন্টে ১৪৩ মিশরী মুদ্রা পাঠানোর ডকুমেন্টও ছিল। চিঠিতে উল্লেখ ছিল- ১৩৮৫ হিজরীর শাবান ও রমজান মাসে সৌদী রেডিওতে আমার কিতাব ‘জিলালুল কুরআনে’র যেসব নির্বাচিত অংশ প্রচার করা হয়েছে সেগুলোর বিনিময়ে এই টাকাগুলো পাঠানো হয়েছে। আমি জানতাম সৌদি রেডিও কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে আমার কিতাবের নির্বাচিত অংশ প্রচার করে আসছে। অতঃপর যখন চিঠির মাধ্যমে জানলাম এই টাকাগুলো নির্দিষ্ট সময়ের বিনিময়, তখন আমি উক্ত সময়ের আগে ও পরের বিনিময়ও চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ লেখক হিসাবে এটা আমার বৈধ অধিকার কিন্তু আমার জন্য পাঠানো টাকাগুলো গ্রহণ করার ও অবশিষ্ট টাকা সমূহ চাওয়ার পূর্বে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন বোধ করলাম। যাতে হিতে বিপরীত না হয়। তাই আমি সায়্যিদ মেজকাম মাহমুদ গমরাবীর সাথে দেখা করে তাকে সবকিছু খুলে বলেছি।

সে আমাকে মৌখিক আলোচনার পরিবর্তে তাদের ফাইলে সংরক্ষিত থাকে মত এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি লেখতে বলেছিল। আমি লিখে তার কাছে জমা রেখেছিলাম। সে পাঠানো টাকাসমূহ গ্রহণ করার ও অবশিষ্ট টাকাগুলো চাওয়ার পরামর্শও দিয়েছিল।

আমি পাঠানো টাকাগুলো গ্রহণ করে অবশিষ্ট টাকাগুলো চেয়ে সৌদি তথ্যমন্ত্রীর বরাবরে একটি চিঠি লিখেছি। চিঠিতে বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমি তথ্য মন্ত্রণালয় ও রেডিও ষ্টেশন থেকে চিঠিটির আনুষ্ঠানিক কোন উত্তর পায়নি। তবে ভাই আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল ও হাজ্জা জয়নব গাযযালী এই বছর হজ্ব থেকে আগতদের থেকে শুনে আমাকে বলেছিল সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমার কিতাব থেকে পূর্বে প্রচারকৃত ও ভবিষ্যতে প্রচারিতব্য অংশের বিনিময় নির্ধারণ করে পূর্বের ঠিকানায় পাঠানো হবে। কিন্ত তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি।

**********

এই বছর কায়রোতে মুসলিম বিশ্বের উলামাদের সম্মেলন চলাকালীন সময়ে উক্ত সম্মেলনে আলজেরিয়ার প্রতিনিধি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তার নাম আমার স্মরণ নেই। তবে হাজ্জা যয়নব তাকে চিনে। কারণ সে যয়নবের কাছ থেকে আমার সাথে টেলিফোন করে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছিল। সে আমার সাথে আলজেরিয়ানদের আক্বীদা- বিশ্বাসের অবস্থা সম্পর্কে কথা বলেছে। সে বলেছে, আলজেরিয়ায় বিপ্লবের ভিত্তি ছিল ইসলাম। জনগণও ইসলামকে ভালবাসে। তবে কিছু মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানেনা। কারণ দীর্ঘদিন থেকে ফ্রান্সের উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জনগণকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের নামে এবং সামাজিক ও

অর্থনৈতিক সংস্কৃতি প্রচারের আড়ালে কমিউনিজমের চিন্তাধারা প্রচারের নিমিত্তে একটি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল- ইসলামী ভাবপুষ্ট কেউ এর মোকাবেলা করার ময়দানে নেই। কারণ আলেম-উলামা ও বক্তারা এখনো সনাতন পদ্ধতিতে কাজ করছে। যা আদৌ এসব ধ্বংসাত্মক স্রোতের প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। তাই এই পথে মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এটা ছিল আলজেরিয়ার সর্বশেষ বিপ্লবের পূর্বের অবস্থা। সে আমাকে ইসলামী সামাজিক নিয়ম-নীতি ও সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের পন্থা সম্পর্কে একটি ছোট পুস্তিকা লিখতে বলেছে। আমি বলেছি, এই বিষয়ে আমার তিনটি কিতাব আছে। যথা-ইসলামে সামাজিক ন্যায়নীতি, বিশ্বশান্তি ও ইসলাম এবং ইসলাম ও পুজিবাদের যুদ্ধ। উপরন্ত

এই বিষয়ে লিখিত উস্তাদ মওদুদীর কিছু বইয়ের নামও তাকে বলেছি। সে বলল আমি এসব চাচ্ছি না। আমি চাই ছোট একটি পুস্তিকা- যেটি আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগতরা পড়ার পর ফ্রান্স ভাষায় তা অনুবাদ করা হবে। কারণ আলজেরিয়ার অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধুমাত্র ফ্রান্স ভাষা বুঝে। আর আপনি যেসব কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলো আরবী শিক্ষিতরা শুধু পড়তে পারবে। তারা সংখ্যায় খুবই নগন্য। আমি তাকে ছোট পুস্তিকাটি লেখার ওয়াদা দিয়েছি। কিন্তু আমি জেনেছি পুস্তিকাটি লেখার পূর্বে সে দ্রন্ত মিসর ত্যাগ করে চলে গেছে।

********

লেবাননের মুফতী জাওজু জেনারেল ছা’আদ ও উত্তাদ জামাল ছানহুরীকে নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। আমার মনে হয় জেনারেল ছা’আদ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার জয়েন্ট সেক্রেটারী। তারা আবর দেশ সমূহের পারস্পরিক রাজনৈতিক বিরোধ মিটিয়ে ও.আই.সি-র তৎপরতাকে বেগবান করার ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলেছে। এই ব্যাপারে আমার মত জানার জন্য তারা আমার কাছে এসেছে।

তারা আমাকে অবহিত করেছে যে, ও.আই.সির লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্তে তারা একটি ম্যাগাজিন প্রকাশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই ব্যাপারে আমার মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া তাদেরকে জানালাম। এরপর তারা উক্ত দুই মহৎকাজের পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত হলে আমার সাথে আবারও দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এটাই ছিলো তাদের সাথে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।

আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, আমার মুক্তি লাভের পর আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের নদওয়াতুল উলামা ও পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কিছু চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল।

চিঠিগুলো ছিল ইংরেজী ভাষায় লিখিত। চিঠিগুলোর প্রেরক সম্পর্কে এখন আমার বিস্তারিত কিছু জানা নেই। তবে একটির প্রেরক ছিল গোলাম আহমদ ৷ আমার মনে হয় সে করাচীর জামায়াত ইসলামীর আমীর। উল্লেখ্য তখন জামায়াতের আমীর মওদুদী বন্দী ছিল। অন্যটির প্রেরক ছিল সিদ্দীকী। তৃতীয়টির প্রেরক ছিল নদওয়াতুল উলামার রেক্টর।

আমার জানামতে প্রথম চিঠিতে বা পাকিস্তান থেকে প্রেরিত অন্য এক চিঠিতে আমি সহ মুক্তি প্রাপ্তদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে উল্লেখ করেছে যে, আপনারা দীর্ঘ দশ বছর পর মুক্তিলাভ করেছেন। অথচ ভারতীয় নেতা নেহেরু পৌত্তলিক ও ত্রিত্বাদের বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আক্রমণ কারীদেরকে বন্দী না করে

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের শাসকরা এই রকম উদারতা প্রদর্শন করে না। পুরঃরায় আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছে- মুসলমান বন্দী হোক বা মুক্ত হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিম্মায় থাকে।

দ্বিতীয় চিঠি-সিদ্দীকির চিঠি-তে উল্লেখ ছিল যে, আমার দুটি কিতাব উর্দূতে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে আমার ‘ইসলামে সামাজিক ন্যায়নীতি’ বইটিও উর্দুতে প্রকাশিত হয়েছে এবং উক্ত কিতাব দুটিকে ইংরেজীতেও অনুবাদ করার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। কারণ ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক ইংরেজীতে কথা বলে। সে চিঠিতে আরো উল্লেখ করেছি যে, কয়েক বছর পূর্বে এখানে প্রকাশিত আপনার ‘ইসলামে সামাজিক ন্যায়নীতি’ বইটি থেকে অর্জিত টাকা হতে আপনার প্রাপ্য পাঠাতে পারিনি বলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কারণ ব্যাপক প্রচারার্থে আমরা বইটির মূল্য রেখেছি খুবই কম। তাই বইটি থেকে অর্জিত টাকার পরিমাণ ছিল নিতান্ত নগন্য। তবে ভবিষ্যতে আপনার নতুন দু’টি কিতাব প্রকাশের পর উল্লেখযোগ্য একটি এমাউন্ট আপনার জন্য পাঠাব। কিন্তু তার কথা বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে নদ্ওয়া থেকে প্রেরিত তৃতীয় চিঠিতে উল্লেখ ছিল যে, আপনার ও আমাদের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তাধারা ও প্রকাশনা বিনিময় করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ মুসলমানরা কুসংস্কার ও দোষ-ক্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন থাকতে চাইলে এবং ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে চাইলে পারস্পরিক চিন্তাধারা আদান-প্রদান করতেই হবে।

পাকিস্তান ও ভারত থেকে প্রেরিত কোন চিঠির উত্তর দেওয়ার সময় আমি পাইনি। কারণ সেগুলো আমার কাছে পৌঁছেছে দেরীতে। আর তাদের প্রেরিত চিঠিগুলো ব্যতিত তাদের সাথে অন্য কোন যোগাযোগ আমার হয়নি।

আমি পূর্বে যেসব যোগাযোগের কথা বর্ণনা করেছি তা ব্যতিত অন্য কোন যোগাযোগের কথা আমার স্মরণ নেই।

******

অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সম্পর্ক

আমি জেল থেকে মুক্তি লাভের পর কারারুদ্ধ ও বাইরে অবস্থানরত ইখওয়ানদের সাথে আমার সম্পর্কের কথা উপরে তুলে ধরেছি। আন্দোলনই ছিল সেসব সম্পর্কের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সেতু বন্ধন। উল্লেখিত যোগাযোগ ব্যতিত অন্য কোন যোগাযোগের কথা আমার স্মরণ নেই। তবে এই বছর রাসূল বিরে থাকাবস্থায় মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ আতিয়্যা ইসকান্দারিয়ার অধিবাসী মুমিন ও লিবিয়া থেকে আগত এক ব্যক্তিকে নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। লিবিয়া থেকে আগত ব্যক্তিটির নাম আমার মনে পড়ছেনা। তবে তার কথা থেকে বুঝলাম ইসলামী আন্দোলন কিংবা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের সাক্ষাতের সময় আমার সাথে ভাই আলী উসমাবী ছিল। তখন সে তার নববধুকে নিয়ে বিবাহত্তোর কিছু সময় রাসূল বিরে থাকার জন্য এসেছিল। উক্ত সাক্ষাতে মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ বলল, কমিউনিজমের অপ্রতিরোধ্য স্রোত ঠেকাতে সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টে ইখওয়ানদের যোগদানের ব্যাপারে সায়্যিদ জাকারিয়া মুহিউদ্দীন কিছু ইখওয়ানের সাথে আলোচনা করেছে। সে আরো বলেছিল যে, সাইয়েদ জাকারিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য মুর্শিদ হাছান হুদায়বীর সাথেও দেখা করেছে। আমি তাকে বলেছি এসব নিছক গুজব মাত্র। এই সম্পর্কে আমি জানি যে, হালওয়ানে অবস্থিত যুবক নেতাদের ক্যাম্পের অধিকাংশ লেকচারার কমিউনিষ্ট ঘরনার। তারা সমাজতন্ত্রের আড়ালে মার্কসবাদী চিন্তাধারা প্রচার করার কারণে এবং পরোক্ষভাবে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর আঘাত হানায় সেখানকার যুবকরা অসন্তুষ্টি ও বিক্ষোভ প্রকাশের কয়েক সাপ্তাহ পর সায়্যিদ জাকারিয়া মুহিউদ্দীন সেই ক্যাম্পটি পরিদর্শন করেন। তিনি যুবকদেরকে বলেছেন, এই দেশটি কমিউনিষ্ট শাসিত দেশ নয়। এখানে প্রত্যেকের চিন্তাধারা নিজ নিজ চিন্তাধারা হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি ক্যাম্পের ইসলামী ঘরনার শিক্ষক ড. কামাল আবুল মজদের সাথে এই মর্মে আলোচনা করেছে যে, কিভাবে সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টে ইসলামী মতাদর্শ প্রচার ও বিস্তার করা যায়।

এই সংবাদটি আমাকে বর্ণনা করেছে আমার গ্রামের এক যুবক শাজালী। যে আসয়ুতে অবস্থিত ‘মা’হাদ আল-মুয়াল্লিমে’র শিক্ষক ও হালওয়ান ক্যাম্পে অংশ গ্রহণকারী যুবক নেতাদের একজন। সে হালওয়ানে থাকাবস্থায় আমার সাথে দেখা করেছে। তখন তার সাথে

ছিল সেখানে উপস্থাপিত কিছু বক্তৃতার পান্ডুলিপি৷ আমি পান্ডুলিপিতে চোখ বুলিয়ে দেখেছি সেখানে সমাজতন্ত্রের আড়ালে কমিউনিজমের পায়গাম বিদ্যমান। তারা সমাজতন্ত্রকে আরব বিশ্ব থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে

আরবী সমাজতন্ত্র বলে না; বরং বলে সমাজতন্ত্রের আরবী প্রয়োগ। যাতে কাল মার্কসের সমাজতন্ত্রই মূল চালিকা শক্তি হয়। আমি সে যুবককে বলেছি পান্ডুলিপিটি কিছু সময়ের জন্য আমার কাছে রেখে যাও পরবর্তীতে আমি তোমাকে তা ফিরিয়ে দিব। সে তাই করল।

আমি যখন যুবকটির সামনে বললাম, এই বক্তৃতামালা কমিউনিজমের রংয়ে রঙ্গিত। তখন সে বলল এই কারণে যুবকরা বিক্ষোভ করেছে। এরপর সাইয়্যেদ জাকারিয়া মুহিউদ্দীন সেখানে উপস্থিত হয়ে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছে। সে আরো উল্লেখ করেছে যে, সমস্ত যুবক ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস উপেক্ষিত হওয়ার অসন্তুষ্ট হলেও তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে তাদের মধ্যে দ্বীনি চেতনাবোধ থাকা সত্ত্বেওে ঐসমস্ত বক্তৃতামালা তাদের চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। তাই তাদের আবেগী প্রবণতা ও চিন্তাভাবনার মধ্যে ব্যাপক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

তার এই মূল্যায়নটি যথার্থ। এটি আরো স্পষ্ট হবে যদি এসব ক্যাম্পে কমিউনিষ্ট নির্দেশনার আধিপত্যের ও নৈতিক অবক্ষয়ের যেসব খবর দৈনিক পত্রিকায় বিশেষকরে ‘আত-তালিয়া’, ‘আল-কাতেব’ ‘রোজ ইউসুপ’ ও ‘ছাবাহাল খাইর’ ম্যাগাজিনে পরিবেশিত হয়েছে তার উপর চোখ বুলানো হয়। এরদ্বারা অনুমিত হবে যে, সেসব ক্যাম্পে বিরাজমান চিন্তাজগতের সামনে ইসলামী ভাবাদর্শ প্রচারের কার্যক্রম অত্যন্ত দুর্বল ও নগন্য। আরো অনুমিত হবে যে, উভয় পাল্লা বরাবর নয়; বরং ধর্মদ্রোহীতা, বস্তুবাদীতা ও নৈতিক অধঃপতনের পাল্লাই ভারী।

******

ইখওয়ানের পরিমন্ডলের বাইরে অন্যান্যদের

সাথে আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগ

১৯৬০ সালের শেষের দিকে লিমান তাররায় থাকাবস্থায় আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা খুব অবনতি হয়। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি কম থাকায় লিমান হাসপাতালের চিকিৎসা আমার জন্য যথেষ্ট হয়নি। সে সময় আমার বন্ধুদের থেকে শুনেছি তাদের পরিচিত মা’আদের আলহাজ হুসাইন সিদকীর পরিবার আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে খুবই উদ্দিগ্ন। তারা আমার কিছু কিতাব পড়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাকে অন্য কোন উন্নত হাসপাতালে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চায়।

আমি সুনির্দিষ্টভাবে এসব অপরিচিত মানুষেরা আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ জানিনা। হয়ত তারা আমার কিছু বই পড়ার কারণে অথবা খাজা জয়নব গাজ্জালীর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে (যিনি তখন নিঃস্ব ও হতদরিদ্রদের সাহায্য সহযোগীতায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করত) অথবা জর্ডানী শাইখের সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছে। তবে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এরপর আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আরো অবনতি হওয়ায় কারা বিভাগের চিকিৎসক পরিষদ কোন উন্নত হাসপাতালে আমার চিকিৎসা করার দাবী তোলার প্রেক্ষিতে প্রধান ডাক্তার উক্ত বিভাগের অন্যান্য দায়িত্বশীল ডাক্তারদেকে নিয়ে বৈঠক করে আমাকে অন্যত্র স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে আমাকে আধুনিক মু’নীল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চেকআপ করে হৃদপিন্ডে অপ্রতুল রক্ত সরবরাহজনিত বুকের ব্যথা ধরা পড়েছে। এই রোগটি ইতিপূর্বে কারাগার হাসপতালে চেকআপের যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকার কারণে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলনা বলে ধরা পড়েনি। সাথে সাথে আমার শ্বাস যন্ত্রে ও নাড়ীভূড়িতে রোগ ছিল। আমি মু’নীল হাসপাতালে ছয় মাস অবস্থান করে কারা হাসপাতালে ফিরে গিয়েছি। পরবর্তী বছর পুণঃরায় আমার স্বাস্থ্য অবনতি হওয়ার পর মু’নীল হাসপাতালে আবারো ছয় মাস অবস্থান করে কারা হাসপাতালে ফিরে গিয়েছি। এরপর তৃতীয়বার স্বাস্থ্য অবনতি হওয়ার কিছুদিন পর আমি মুক্তি লাভ করেছি।

এরপর আলহাজ্ব হুসাইন সিদকী ও তার পরিবার আমাকে দেখতে এসেছে। তারা আমাকে বলেছে, জর্ডানী শাইখ আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবর রাখে। তিনি একজন খোদাভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি। আমি তাকে আগে চিনতাম না। আমি শুনেছি পিছলে পড়ে তার পা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তিনি নড়াচড়া করতে পারেন না। তাই আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে তাকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
40

এই সময় আমার কারামুক্তি উপলক্ষে আলহাজ্ব হুসাইন সিদ্কীর ঘরে ও খাজা জয়নবের ঘরে খানায় দাওয়াতে আমার সাথে খাজা জয়নব গাজ্জালীর পরিচয় হয়। এরপর আমি আলহাজ্ব হুসাইন সিদ্কী, তার পরিবারবর্গ, খাজা জয়নব গাজ্জালী ও আমার ভাই মুহাম্মদ কুতুবকে নিয়ে প্রথম পর্বের মত জর্ডানী শাইখকে দেখতে গিয়েছি। আমরা হুসাইনের গাড়ি নিয়ে গিয়েছি।

এরপর আমি আরো দুই বা তিনবার শাইখকে দেখতে গিয়েছিলাম। একবার আমার সাথে মুহাম্মদ ছিল, আরেকবার আমি একাকী ছিলাম। যে সাক্ষাতে মুহাম্মদ সাথে ছিল সে সময় শাইখকে দেখতে আমাদের অপরিচিত এক ব্যক্তি এসেছিল এবং শাইখের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার মুজহের আশুর উপস্থিত হয়েছিল। আর যে সাক্ষাতে আমি একাকী ছিলাম সে সময় শাইখ নিজ দেশের যুবকদের নৈতিক অধঃপতনের উপর অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। আমি শাইখকে সান্তনার সূরে বলেছি, এখনো এমন কিছু সৎ ও নিষ্ঠাবান যুবক রয়েছে যারা ধার্মিক ও আদর্শবান। আমি এরদ্বারা পরোক্ষভাবে নতুন সংগঠনটির দিকে ইংগিত করেছি। শাইখ আমার কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বলেছে, তাদের সাথে কি আপনার সম্পর্ক আছে? আমি বলেছি, হ্যাঁ। তারা আমার দিকনির্দেশনা মতে চলে। শাইখ বলেছে, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুক ও উন্নতিসাধন করুক।

আলোচনার এক পর্যায়ে শাইখ বললেন, আমি শহীদ হাসানুল বান্নাকে বলেছিলাম, রাজনৈতিক জটিলতায় প্রবেশ না করে দেশের ভবিষ্যত মুসলিম যুব সমাজকে যোগ্যভাবে গড়ে তুলুন। কিন্তু তার শাহাদতের পর ইখওয়ান ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যুবকরা ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়। ফলে সর্বত্র অধঃপতন ছড়িয়ে পড়ে। তখন শাইখকে আমি ঐসমস্ত নিষ্ঠাবান যুবকদের কথা সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

********

কিছু বিক্ষিপ্ত সম্পর্কের বিবরণঃ

আমি জেল থেকে মুক্তি লাভের ও পরবর্তীতে বন্দী হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের আট মাস কায়রোতে অবস্থা করেছি এবং গত বছরের ও এই বছরের অবশিষ্ট ছয় মাস গরম থেকে দূরে থাকার জন্য রাসূল বিরের গ্রীষ্মনিবাসে অবস্থান করেছি। কারণ গরমের প্রচন্ডতায় আমার হার্ট বিট বেড়ে যায়। উভয় স্থানে আমার সাথে দলে দলে লোক সাক্ষাৎ করেছে। তাদের কেউ কেউ আমার পুরানো পরিচিত ব্যক্তি যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক রাখেনা তবে তারা সাহিত্যগত ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচিত। আর তাদের অধিকাংশই আরব বিশ্বের ও মিসরের ঐ সমস্ত যুবক যারা আমার কিতাব পড়েছে। তবে আমি জেলে যাওয়ার পূর্বে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা প্রত্যেকেই এখন বিশ বা ত্রিশের কোটায়। আমি জেলে প্রবেশের পূর্বে ছিল উড়তি যুবক বিধায় তাদের সাথে সম্পর্ক না থাকাই স্বাভাবিক৷ তাদের এ সকল সাক্ষাতে আমার বা অন্যান্য লেখকদের বইয়ে লিখিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অথবা এই অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে উম্মুক্ত আলোচনা হত। আলোচনায় নির্দ্ধিধায় যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারত। তাদের কেউ কেউ আলোচনার শেষ পর্যন্ত থাকত আর কেউ কেউ আলোচনার মাঝখানে চলে যেত।

এই রকম যৌগিক বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের নাম ক্ষণস্থায়ী ভাবে আমার মনে থাকত। আমি বৈঠকগুলোকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতাম না। কারণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল- তারা যার কথা শুনেছে বা যার বই পড়েছে তাকে চিনা ও জানা এবং তার চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা। আর আমার উদ্দেশ্য ছিল যে যুব প্রজন্মের সাথে আমার পরিচিতি নেই তাদের চিন্তাধারা শুনা এবং এইরকম উন্মুক্ত বৈঠকে পরিবেশ অনুযায়ী আমার চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা।

উক্ত বৈঠকসমূহে অংশগ্রহণ কারী কিছু যুবকের মাঝে দ্বীনের খেদমত করার প্রবল ইচ্ছা ও আকাংখা এবং জানার উদগ্রীবতা ও ইসলামের যোগ্য দাঈ হবার বিচলতা দেখা সত্ত্বেও তাদের অবয়র ব্যতিত তাদের নাম আমার স্মরণ নেই। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ, আমি অসুস্থ হওয়ার পূর্বেও বন্ধু মহলে এইজন্য প্রসিদ্ধ ছিলাম যে, আমি কারো নাম স্মরণ রাখতে না পারলেও তার গঠন-আকৃতি মনে রাখতে পারি। আমি আশাবাদী যে, সেসব যুবক কেউ কেউ সঠিক অনুশীলনে গড়ে উঠে ভবিষ্যতে কর্মঠ কর্মীদের দলভুক্ত হবে।

আমি নতুন সংগঠনের সাথে জড়িত হলেও পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা ব্যতিত কাউকে উক্ত সংগঠনে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করিনি। এমনকি ইখওয়ানের যুবকদেরকেও বরং আমি উক্ত সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সম্পর্কে বলতাম, তারা যেমন দ্রুত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে অনুরূপ তরবিয়াত ব্যতিত দ্রুত সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে। এই বিশাল দলের কি প্রয়োজন ছিল? আমার মতে এককভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে কাজ আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন।

উক্ত সময়ে মিসরী বা অন্যান্য দেশের যেসব যুবক আমার সাক্ষাতের জন্য ভিড় জমাত তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল এই রকমই। তাদের নাম ঠিকানাও আমার জানা নেই। তবে ভবিষ্যতে কাজের জন্য তারা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। সেসময় বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তাদের সাথে আমার সম্পর্কে গভীর হয়নি। ব্যস্ততাগুলো হলো- (১) নতুন সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি না করে বরং কমিয়ে সংগঠনকে আমার মন মত সাজানোর ব্যস্ততা। (২) শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমি নতুন মানুষদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা পছন্দ করতাম না। (৩) বই লেখার এবং বই লেখার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জির অধ্যায়নের ব্যস্ততা।

উপরন্তু তাদের কারণেও সম্পর্কটা পূর্ণতা লাভ করেনি। কারণ মিসরী হোক বা ভিন্ন দেশী হোক তারা দুই জন বা তিন জন করে আমার কাছে উপস্থিত হত। আমি তাদের আলোচনা থেকে বুঝতাম তারা একত্রে পড়ে বা পরস্পর কিতাব আদান-প্রদান করে। অর্থাৎ তারা শুধু বন্ধুর মত পারস্পরিক মত বিনিময় করত।

আমি তাদের কথার উপর অতিরিক্ত কিছু বলেনি এবং কাউকে সংগঠন করার পরামর্শও দেয়নি। আমি তাদেরকে শুধু এই উপদেশটি দিয়েছি যে, তোমাদের মধ্যে যে যোগ্যতা অর্জন করবে সে কর্মঠ কর্মীদের দলভুক্ত হবে। সময় সংক্ষেপের কারণে, অধিক ব্যস্ততার কারণে এবং অধিক দর্শনার্থীর কারণে এই রকমই ছিল তাদের সাথে আমার সম্পর্ক।

আমি তাদের সাথে সম্পর্কের অবস্থাকে আরো স্পষ্ট ও বোধগম্য করতে চাই। আমি ইতিপূর্বে বলেছি- ভাই আলী উসমাবীর বর্ণনা মতে- যে, আমি ব্যক্তি বা বিক্ষিপ্ত দলকে নিজে পর্যবেক্ষণ করা ব্যতিত সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করব না। এদের ক্ষেত্রেও আমার একই কথা। আমি উপদেশ দিয়ে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করব এবং দলভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ছেড়ে দিব। তাদের কথাবার্তা, আলাপচারিতা ও প্রশ্নাবলী শুনে এবং তাদের কথাবার্তার একাগ্রতা ও তাদের একনিষ্ঠতা দেখে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি, এই সূত্রে তারা আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে।

আমার জানা মতে, ইখওয়ানে যোগদানের পর থেকে উক্ত ইসলামী আন্দোলনে আমার সব গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতার বিবরণ তুলে ধরেছি। তবুও যদি কোন দিক থেকে থাকে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করলে তা জানা যাবে।

তারপরও শেষ কথা হিসেবে কিছু কথা বলার আছে। এখন তা আমি উল্লেখ করব। পাঠক মহল পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করুক বা না করুক। কারণ

আমার দায়িত্ব হল পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমি সেই কথাগুলোকে নিম্মোক্ত কয়েকটি পয়েন্টে উল্লেখ করছি।

১। ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানকে ফাঁসানোর জন্য পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাজানো আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনার অজুহাত তুলে দেশীয় শাসন পরিবর্তনের জন্য ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অন্যান্য অভিযুক্ত মহলকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইখওয়ানের নেতা-কর্মীদের সাথে যে রকম নৃশংস আচরণ করা হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে আমরা ভবিষৎতে এই রকম অন্যায়ের প্রতিরোধ শক্তি দ্বারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি আমাদের সামান্যতম এই বিশ্বাস থাকত যে, এ সব জেল-জুলুম ন্যায় ভিত্তিক বিচারে এমনকি মানব রচিত আইনের আলোকে হলেও নিস্পত্তি হবে। তাহলে কেউ সেই প্রতিরোধের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতো না। আমি জানি, এই বাস্তব সত্য কথা বলে এখন কোন লাভ নেই। তবুও আমার শেষ কথায় তা লিপিবদ্ধ করে দিলাম।

২। নিশ্চয় মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমীন আন্দোলনকে এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায়নাবাদী, ক্রুসেডার ও সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা তারা এই অঞ্চলের মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও আক্বীদা- বিশ্বাস ধ্বংস করতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নিরন্তর ষড়যন্ত্র ও শক্তি ব্যয় করে যাচ্ছে। যদি তারা ইখওয়ানকে প্রতিরোধ করার জন্য আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘটনার মত কৌশল অবলম্বন না করে অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করত তাহলে ইখওয়ান তার দুর্বলতা সত্ত্বেও যায়নবাদী, ক্রুসেডার ও সাম্রাজ্যবাদীদের কুটিল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে পারত। কারণ ইতিপূর্বে ইখওয়ান তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের সফল ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন ও মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তারের পর

মিসরে ধর্মদ্রোহীতা ও নৈতিক অধঃপতনের যে নগ্ন হাওয়া জোরে প্রবাহিত হয়েছিল তা থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

৩। ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল মুসলেমীনকে আঘাত করার পর ধর্মদ্ৰোহীতা ও নৈতিক অধঃপতনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। এখন ইখওয়ানকে আবারো আঘাত করলে সেই স্রোত পুনঃরায় অপ্রতিরোধ্য বেগে বয়ে যাবে। প্রশ্ন আসবে, এই অধঃপতনের জন্য কে দায়ী? এটা স্বতসিদ্ধ যে, অধঃপতনের জন্য এই দেশ ও এই দেশে দীর্ঘ দিন থেকে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা কখনো দায়ী নয়; বরং সেই শাসন ব্যবস্থার শীসকরাই দায়ী। তাই পৃথিবীর প্রত্যেক শাসন

ব্যবস্থা বিশেষত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত শাসন ব্যবস্থা যতটুকু শক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী চরিত্রবান, আদর্শবান ও নীতিবান শাসকের প্রতি। কারণ দেশের শত্রুরা আদর্শগত ও চরিত্রগত অধঃপতিত সমাজ থেকে খুব সহজে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে। আমার উক্ত কথাগুলো কারো কারো জন্য শ্রুতিকটু হলেও আমি তা বলে যাচ্ছি। কারণ আমার দায়িত্ব হল পৌঁছিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করা।

৪। আমাকে বহুবার লোকেরা বলেছে, তোমরা কি শুধু মুসলমান? ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ও নূর আলী নূরের প্রোগ্রামাদি কি ইসলাম প্রচারের জন্য যথেষ্ট নয়? মানুষতো মসজিদে গিয়ে নামা আদায় করছে এবং মক্কা ও মদীনায় গিয়ে হজ আদায় করছে ইত্যাদি। আমি বলতে চায়, ইসলামের পরিধি আরো অধিক বিস্তৃত ও বিশাল। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে গঠন করতে হবে। এরপর মানুষের ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহপ্রদত্ত্ব ও রাসূলপ্রদর্শিত জীবনবিধানকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলাম এমন মতবাদের নাম নয়, যে মতবাদের আলোকে মানুষ গঠন করা ব্যতিত প্রথমে সে মতবাদকে প্রচার করা হবে, এরপর তার আলোকে দেশ পরিচালিত হবে। আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, ইখওয়ানুল মুসলেমীন আন্দোলন মানুষ গঠনের কার্যকরী হাতিয়ার৷ কোন ভুল-ত্রুটির কারণে এই আন্দোলন ধ্বংস করা যাবে না। বিশেষত যদি সেই ভুল-ত্রুটি আন্দোলনের কার্যক্রমে পরিলক্ষিত হয়।

আমি ১৯৫২ সালে ‘হায়াতু শাবাবিত তাহরীর’ দিয়ে ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মার্কিনপন্থী কৃষক সমিতি ও কিছু সুবিধাভোগী যারা হায়য়াতুত তাহরীরকে জরাজীর্ণ অবস্থায় এবং আমার উদ্ভাবিত পন্থার বিপরীতে দেখতে চেয়েছিল তাদের কারণে আমি সেই কাজটি করতে পারিনি।

এরপর ইখওয়ানুল মুসলেমীন আন্দোলনই সেই মহৎ কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে।

যে দেশে এমন আন্দোলন নেই- যে আন্দোলন প্রথমে মানুষ গঠন করবে এবং পরবর্তীতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে- সে দেশে পরিপূর্ণ ইসলাম কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না। এগুলো এমন এক ব্যক্তির কথা যে ইখলাসের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে যাচ্ছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত নিজ দাওয়াত পৌঁছাতে নিরত রয়েছে।

সায়্যিদ কুতুব

সামরিক কারাগার থেকে
45